নিয়মিত প্রকাশনার ৪২ বছর

মাসিক মাহে জিলক্বদ ১৪৪২ হিজরি, জুন'২১

তরজুমান

এ' আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

১১ জিলক্বদ আওলাদে রসুল হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রা.) এর পবিত্র ওরস মোবারক

- ★ সমসাময়িক সকল বাতিলের বিরুদ্ধে সফল মোকাবেলায় হযরতুল আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রাহ.)
- ★ শায়খুল হাদিস শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী (রাহ.) এর ১ম ওফাত বার্ষিকী স্মরণে
- ★ যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী
- ★ হাত তুলে দোয়ার শরয়ী বিধান
- ★ প্রসঙ্গ যঈফ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান

The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

মাসিক
তরজুমান
৪২ তম বর্ষ □ ১১ম সংখ্যা
যিলক্বদ : ১৪৪২ হিজরি
জুন ২০২১, আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
facebook.com/monthlytarjuman

লেখা, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক/ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

তরজুমানে টাকা পাঠানোর ঠিকানা

TARJUMAN -E AHLE
SUNNAT WAL JAMAT
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD. DEWAN
BAZAR BRANCH, CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১০

শানে রিসালত ১০
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিশ্বব্যাপী সুন্নিয়তের জাগরণে শাহানশাহ্-এ সিরিকোট (রহ.) ১৩
মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন শাহানশাহে সিরিকোট হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) ২০
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রসঙ্গ: যঈফ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ২৭
মুফতি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আলকাদেরী

যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ৩০
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী ৩২
মাওলানা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

হাত তুলে দোয়ার শরয়ী বিধান ৩৪
মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

শ্রদ্ধার নয়নে চির অম্লাণ: আববা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) ৩৭
মুহাম্মদ কাসেম রেযা নঈমী

কিতাব অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যুগের চাহিদা পূরণে আনজুমান প্রকাশনার অবদান ৪৩
মওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

প্রশ্নোত্তর ৪৯

মসজিদুল আকসার গুরুত্ব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৫৬
মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

নতুন মেরুকরণে ফিলিস্তিন ৫৯
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

স্বাস্থ্য তথ্য ৬১

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬৩

প্রচ্ছদ: দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরীফ, পাকিস্তান

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাহে জিলক্বদ মুসলিম মিল্লাতের জন্য অতীব গুরুত্ববহ ও ফজিলতপূর্ণ। কেননা এ মাস হতেই হজ্ব সম্পন্নকারীরা বিশ্বের চতুর্দিক হতে মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মনোওয়ারায় হজ্ব সম্পাদন ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জিয়ারতে অংশ নিতে পার্থিব সবকিছু ত্যাগ করে ছুটে আসতে থাকেন। অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় ফরজ হজ্ব সম্পাদন করতে মক্কা মুয়াজ্জামায় আসতে পারছেন না বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯-এর ভয়ঙ্কর থাবার কারণে। ১৯২০ সালেও সৌদিতে বসবাসরত স্থানীয় ও বিদেশীরা সমগ্র জীবনের একান্ত বাসনা (হজ্ব) পালন করতে পেরেছিলেন খুবই সীমিত সংখ্যক ভাগ্যবান মুসল্লি। ভেবেছিলাম ২০২১ সালে লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবানরা নবউদ্যমে আনন্দে 'হজ্ব' করতে মক্কায় আসতে পারবেন। কিন্তু বিধিবাম! এবারেও 'কঠোরতম না' বলে দিয়েছেন সৌদি সরকার কখন পারবে হজ্ব করতে যেতে, কি উপায় বা হবে, কিছুই বলা যাচ্ছে না। পরম দয়ালু আল্লাহ্! আমাদের গুনাহ'র কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারী থেকে আমাদের নাজাত দাও, তোমার রহমতের জোয়ারে আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও, তোমার ঘর বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ ও তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জিয়ারত করার জন্য বৈশ্বিক মহামারী (গজব) হতে আমাদের মুক্তি দাও। আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়ার পথ প্রশস্থ করে দাও। পবিত্র 'হজ্ব' না করিয়ে আমাদের মৃত্যু দিয়ো না হে পরওয়ারদেগার।

বিশ্ব নন্দিত অলীকুল সম্রাট কুতুবুল আউলিয়া আওলাদে রাসূল (দ.) হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৯৬১ সালের ১১ই জিলহজ্ব লক্ষ লক্ষ নবী-অলী প্রেমিক, স্বীয় মুরিদ, ভক্ত-অনুরক্ত, সুন্নি জনতাকে রেখে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে গমন করেন। এ মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা মসলকে আ'লা হযরত'র নীতি-আদর্শ রূপায়নে অসংখ্য কারামতপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নিদর্শন রেখে গেছেন আমাদের জন্য। ইলমে দ্বীনের সর্বপ্রকার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শরীয়ত-ত্বরীক্বত, মারেফাত'র আধাঁর এই বুজর্গ সাহেবানের অমর সৃষ্টি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট চির বিস্ময় নিয়ে দেদীপ্যমান।

১৯৫৪ সালে এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি লগ্নে হুজুর বলেছিলেন 'ইয়া জামেয়া কিস্তিয়ে নূহ (আ.) হ্যায়। মসলকে আ'লা হযরতের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হল এ জামেয়া। যারা জামেয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা নূহ (আ.)-এর কিস্তির আরোহীদের মতো নিরাপদ থাকবে। জামেয়ার জন্য মান্নত করো, মান্নত পুরো হলেই ওয়াদা পুরণ করো অবিলম্বে। হুজুরের জিন্দা কারামত এ জামেয়া। জামেয়ার শিক্ষার্থীরা যুগযুগ ধরে নবী-অলী বিরোধী বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান থেকে দেশে-বিদেশে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা রক্ষার সংরক্ষণে সদা নিয়োজিত। হুজুর ক্বিবলার সুন্নীয়তের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জামেয়া সহ আনজুমান ট্রাস্ট পরিচালিত মাদ্‌রাসা সমূহের শিক্ষার্থীরা। জামেয়া শুধু শরীয়ত নয়, ত্বরীক্বতের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। দেশে-বিদেশে অসংখ্য মাদরাসা, মসজিদ খানকাহ্ হুজুর ক্বিবলার অমর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরিয়ার প্রচার-প্রসারে ও জামেয়াসহ অনজুমান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ নিরবচ্ছিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। হুযুর ক্বিবলার রূহানী ফয়ূজাতে সম্পৃক্ত থেকে গাউসে জমান, আওলাদে রসূল (৩৯তম), হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও দরবারে আলিয়া ক্বাদেরিয়ার বর্তমান পীর সাহেব ক্বিবলা আওলাদে রসূল (দ.) ৪০তম গাউসে জমান সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.) যুগ যুগ ধরে সিরিকোটি (রহ.) এর মিশনের কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে মহীরূহে পরিণত করেছে। হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জামেয়া-আনজুমান প্রতিষ্ঠা করে সুন্নীয়তের পতাকাকে সমুন্নত রাখার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তারই প্রভাবে আমরা আজ নবী-অলী প্রেমিক সুন্নী হতে পেরেছি। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ হতে হুজুর ক্বিবলা চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলনমাদের যে ইহসান করেছেন তা শোধ করার মতো জ্ঞান, সাহস শক্তি কিছুই আমাদের নেই। সততা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে হুযূরের রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে সুন্নীয়তের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানো হবে। আসুন দৃপ্ত শপথে বলীয়ান হয়ে আজকের দিনে এ প্রার্থনা করি।

হুযূর ক্বিবলার একনিষ্ঠ মুরীদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরব্বী সিলসিলা, জামেয়া, আনজুমান ট্রাস্ট (ফাইন্যান্স সেক্রেটারী)-এর আজীবন খেদমতগার আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না . . . . রাজেউন)। এ মহান কর্মীর প্রতি রইলো আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, দো'আ ও কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন।

বিশ্ব আরেকবার প্রত্যক্ষ করল ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্র কতো বর্বর নৃশংশ ও ভয়ঙ্কর, নিরস্ত্র অসহায় শিশু নারীসহ শত শত ফিলিস্তীনি মুসলমানদের নির্দয়ভাবে বোমা বর্ষণ করে শহীদ করেছে। শত শত বহুতল ভবন, মসজিদ সহ অসংখ্য ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মসজিদে নামায রত মুসল্লীদের বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়ে চরম ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে ইহুদিরা। জেরুযালেম ও গাজা হতে ইসরাইলী বসতী উৎখাত এবং মসজিদুল আকসা উম্মুক্ত করে দেয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছি। খুনী নেতানিয়াহু গংদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জানায়, এদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হোক এবং ফিলিস্তীনিদের স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য, চীন-রাশিয়া ও জাতিসংঘসহ সকল পক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছি। সমানাধিকার নিয়ে ফিলিস্তীনিরা নিজ ভূমিতে বসবাস করুক। এটাই আমাদের কাম্য।

কথায়-কথায় মিথ্যা শপথ করা মুনাফেকীর লক্ষণ

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমা : (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্থ করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্থ করে দাও। আল্লাহ তোমাদের স্থান প্রশস্থ করে দিবেন। আর যখন বলা হয় 'উঠে দাড়াও' তখন উঠে দাড়াও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন। এবং আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা রাসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরজ করতে চাও, তবে আপন আরজ করার পূর্বে কিছু সাদক্বাহ প্রদান করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম ও খুব পবিত্র। অতঃপর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়া পরবশ। তোমরা কি এতে ভয় পেয়েছো যে, তোমরা স্বীয় আবেদনের পূর্বে কিছু সাদক্বাহ দান করবে? অতঃপর যখন তোমরা এটা করোনি এবং আল্লাহ স্বীয় করুনা সহকারে তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন; সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো। যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকো। আর আল্লাহ খবর রাখেন যা তোমরা করো। আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা এমন লোকদের বন্ধু হয়েছে, যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে, তারা না তোমাদের অন্তর্ভুক্ত না তাদের অন্তর্ভুক্ত, তারা জ্ঞাতসারে মিথ্যা শপথ করে। [সূরা আল মুজাদালাহ ১১-১৪]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ এর শানে নুযুল : উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দরবারে 'বদর যুদ্ধে' অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ 'বদরী সাহাবী' নামে বিশেষ সম্মান মর্যাদার অধিকারী। একদা কতিপয় বদরী সাহাবী রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মজলিসে এমন অবস্থায় পৌছলেন যখন মজলিস লোকে ভরপুর ছিল। তাঁদের বসার স্থান সংকুলান হয়নি। তাঁরা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সালাম দান করত: মজলিসে বসার স্থানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মজলিসে উপস্থিত কেউ তাঁদের বসার সুযোগ করে দিচ্ছিলনা। তখন রাসূলে করীম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে উপবিষ্টদের উঠিয়ে বদরী সাহাবীগণের বসার জন্য স্থানের সংকুলান করে দিলেন। যাঁরা উঠে গেলেন তারা এতে কিছুটা কষ্ট বোধ করলেন। তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করলেন- মুমিনগণ! যখন তোমাদের কে বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্থ করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্থ করে দাও। বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের স্থান প্রশস্থ করে দিবেন (দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে)। আর যখন বলা হয় উঠে দাড়াও, তোমরা তখন উঠে দাড়াও। উপরোক্ত রেওয়ায়তের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও বুযুর্গানেদ্বীনের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়া এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদিওবা মসজিদে হয়, তবুও জয়েয বরং সুন্নাত। উপরোক্ত ঘটনা মসজিদে নববী শরিফেই ঘটেছে। এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর দরবারে খুবই প্রিয় আমল। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে। কারণ, এতে মুসলিম মিল্লাতের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সুসংহত হয়। [তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান ও নুরুল ইরফান]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا এর শানে নুযুল: উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় তাফসীর বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে খোদা আশরফে আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে দিবারাত্রি মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিশ সমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শ্রবণে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক আলাদাভাবে তাঁর সাথে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বালাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রকৃত মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারনে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এই বোঝা হালকা করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করলেন যে, যারা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে একান্তে গোপন কথা বলতে চায়,তারা প্রথমে কিছু সাদকাহ প্রদান করবে। আয়াতে কুরআনে সাদকাহর পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম এর উপর আমল করেছেন। তিনি এক দিনার সাদকাহ প্রদান করে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় গ্রহণ করেন।

উল্লেখ থাকে যে, একমাত্র সাইয়্যেদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুই উপরোক্ত আয়াতের বিধানের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ উক্ত আয়াতের বিধানের উপর আমল করার সুযোগ পায়নি। কারণ, এ আদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাই এ আয়াতের আদেশটি রহিত হয়ে যায়। মাওলা আলী শেরে খোদা প্রায়ই বলতেন 'পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যার বিধানের উপর আমি ব্যতীত অন্য কেউ আমল করার সুযোগ পায়নি। আদেশটি রহিত হয়ে যায়।

[তাফসিরে ইবনে কাসির, রুহুল বায়ান ও খাযায়েনুল ইরফান]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم এর শানে নুযুল: বক্ষ্যমান আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে তাফসীর বেত্তাগন উল্লেখ করেছেন- আলোচ্য আয়াতখানা মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে নিজেদের কে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দান করলেও গোপনে আন্তরিকভাবে ইহুদিগণের সাথে বন্ধুত্ব-ভালবাসা রাখতো। তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলতো এবং মুসলমানদের গোপন রহস্য ও বিষয়াবলি তাদের নিকট ফাঁস করে দিত। এ আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে مغضوب عليهم তথা আল্লাহর গজব প্রাপ্ত সম্প্রদায় হলো ইহুদি। কোন কোন রেওয়ায়তে উল্লেখ আছে যে, উদ্ধৃত আয়াতখানা মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, এখন তোমাদের মাঝে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ, দেহাবয়ব বেটে, গোধুম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমন্ডিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? সে শপথ করে বলল আমি এরূপ করিনি, এরপর সে তার সঙ্গীদের ডেকে আনল এবং তারাও মিথ্যা শপথ করল। তখনই আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(তাফসীরে কুরতুবি, রুহুল বায়ান ও খাযায়েনুল ইরফান শরীফ)

আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদি-খৃষ্টান, কাফির-মুশরিকসহ কোন অমুসলিম বেদ্বীনের সাথে মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব -ভালোবাসা স্থাপন করা কোন অবস্থায় জায়েয নেই। এটা সর্বাবস্থায় হারাম ও কুফরী। যৌক্তিকতার নিরিখে এটা সম্ভবপরও নয়। কেননা মুমিনের আসল সম্পদ ও মূলধন হলো আল্লাহ-রাসূলের মহব্বত। কাফির-মুশরিকগণ আল্লাহ রাসূলের শত্রু। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআনে করীমের অনেক আয়াতে কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এবং যে মুসলমান কাফের-মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদের দলভূক্ত করত শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকলকে উপরোক্ত দরসে কুরআনের উপর আমল করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমিন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

কুরআন মজীদ আল্লাহর সর্বোত্তম কিতাব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

অনুবাদ: হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ। [সহীহ্ মুসলিম]

হযরত মালিক ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে কখনো তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) ও তাঁর রসূলের সুন্নাত (আল হাদীস)। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও অন্যান্য নবী রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের তৃতীয় মূলনীতি বা মৌলিক ফরজ। যুগে যুগে নবী রসূলগণের উপর আসমানী কিতাব ও অসংখ্য সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, এর প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। তবে পবিত্র কুরআনে প্রসিদ্ধ চারখানা কিতাব ও কয়েকটি সহীফা অবতরণের কথা ঘোষিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বা সামগ্রিকভাবে নাযিলকৃত সব আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা মু'মিন মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ও পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা ফরজ। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআনসহ পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান না থাকলে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে না।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ-

(মুত্তাকী তারাই) যারা ঈমান আনে আপনার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الحديث كتاب اللهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

[رواه مسلم]

عَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَرَكت فِيْكُمْ امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

[الموطا للامام المالك]

[সূরা আল বাক্বারা: আয়াত-৪]

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে নাঈমী প্রণেতা হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যেমনিভাবে পবিত্র কুরআন মেনে নেওয়া অপরিহার্য, তেমনি আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখা আবশ্যকীয়। তবে এ ক্ষেত্রে ঈমান নেয়ার মধ্যে দু' ধরনের পার্থক্য রয়েছে,

১. সমস্ত কুরআন মেনে নেয়াও অপরিহার্য এবং এর (মুহকাম) যেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর আমল করাও অপরিহার্য।

২. অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলো পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সবগুলো সত্য; কিন্তু সেগুলোর উপর আমল করা আমাদের উপর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী সবিস্তারে জানা অপরিহার্য কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আমাদের জন্য প্রয়োজন নেই। [তাফসীরে নাঈমী ১ম খন্ড]

পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِه وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ-

অর্থ: হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং তিনি যে গ্রন্থ তাঁর রসূলের (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের) প্রতি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন

এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন এ সবের প্রতি ঈমান আন। [সূরা নিসা: আয়াত-১৩৬]

প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবসমূহ

নবী রসূলগণের উপর অবতীর্ণ আসমানী চারটি প্রসিদ্ধ কিতাব ও কয়েকটি সহীফার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এসেছে।

প্রথম: ১. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামের মাধ্যমে ২৩ বছর ব্যাপী কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَ ۙ

অর্থ: বরকতময় সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যেন তিনি সমগ্র জগতবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করেন। [সূরা ফুরকান: আয়াত-১]

যে কুরআন মানবজাতির জন্য খোদাপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন।

وَ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ

অর্থ: আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করলাম।

[সূরা নাহ্ল: আয়াত-৮৯]

যে কুরআনের আদ্যপান্ত, প্রতিটি অক্ষর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাণী প্রতিটি ঘটনা, নিরেট অকাট্য সত্য। এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ ۛ فِیْهِ ۛ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۙ-

অর্থ: এই সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য যা পথ নির্দেশক। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বর্ণনা মতে এ কুরআনে রয়েছে- ৬৬৬৬টি আয়াত (প্রসিদ্ধ মত)

আল কুরআনে বিষয়ভিত্তিক আয়াতের বিন্যাস

জান্নাতের ওয়াদা বিষয়ক ১০০০ আয়াত, জাহান্নামের ভয় বিষয়ক ১০০০, আদেশসূচক ১০০০, নিষেধ সূচক ১০০০, উদাহরণ ১০০০, ঘটনাবলী সংক্রান্ত ১০০০, হারাম বিষয়ক ২৫০, হালাল বিষয়ক ২৫০, আল্লাহর তাসবিহ্ পবিত্রতা বিষয়ক ১০০, বিবিধ ৬৬, মোট-৬৬৬৬।

কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৮৬,৪৩০, কুরআনের অক্ষর সংখ্যা ৩২৩৭৬০, আল্লামা সুয়ুতীর মতে ৩২৩৭৬১, তিলাওয়াতে সিজদা ১৪, এক বর্ণনায় ১৫, মোট সূরা ১১৪, মক্কী সূরা ৮৬, মাদানী সূরা ২৮।

দ্বিতীয়ত: তাওরাত: এটি হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব, এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِیْلَ ۙ﴿۳﴾ (مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ-

অর্থ: তিনি (আল্লাহ্) সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমার্থক, আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তাওরাত ও ইনজিল ইতোপূর্বে মানব জাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং তিনি কুরআনও অবতীর্ণ করেছেন।

[সূরা আলে ইমরান: আয়াত-৩-৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন-

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ وَ قَفَّیْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ بِالرُّسُلِ

অর্থ: এবং আমি নিশ্চয়ই মূসা আলায়হিস্ সালামকে কিতাব দিয়েছি এবং এরপর পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-৮৭]

তাওরাত সম্পর্কে গবেষকদের অভিমত হলো বারেল সম্রাট বখতে নসর, মসজিদুল আকসায় আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে তাদের অগণিত লোকদের বন্দী করে। আল্লাহর ঘর মসজিদুল আকসায় তারা হামলা করে হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম'র নিদর্শনাদিতে অগ্নিসংযোগ করে এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তাওরাতসহ যাবতীয় কিতাব জ্বালিয়ে তারা ভস্মিভূত করে। [আন নাবিয়ুল খাতাম, মানাযির আহসান গিলানী]

তৃতীয়ত: যবুর এটি অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের উপর পবিত্র কুরআনে যবুর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوْنَ اِنَّ فِیْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِیْنَ ۙ

অর্থ: "আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ, পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে রয়েছে বাণী, সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইবাদত করে। [সূরা আম্বিয়া: আয়াত-১০৫-১০৬]

আরো এরশাদ হয়েছে-

وَاٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থ: আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।

[সূরা নিসা: আয়াত-১৬৩]

চতুর্থ: ইঞ্জিল: এটি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালামের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের উপর ইঞ্জিল শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে

وَ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ-وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ-وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ□

অর্থ: ''মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম। তাতে ছিলো পথের নির্দেশ ও আলো।

[সূরা মায়িদা: আয়াত-৪৬]

বর্ণিত প্রসিদ্ধ চারটি কিতাব ব্যতীত পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম্ আলায়হিস্ সালাম ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সহীফার কথা উল্লেখ হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে-

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُولٰى صحف ابراهيم وموسى

অর্থ: এতো আছে, পূর্ববর্তী গ্রন্থে ইবরাহীম ও মুসার গ্রন্থে-

[সূরা গাশিয়া, আয়াত-১৮-১৯]

এতে বুঝা যায় হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামের উপর তাওরাত ছাড়াও কিছু সহীফা অবতীর্ণ হয়েছিল।

এভাবে নবী ও রসূলগণের উপর যে আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহ নাযিল হয়েছিল এর কতিপয়ের বর্ণনা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে।

আরো অনেক সহীফা রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে দেননি, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, এসব কিতাব বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকলেও এগুলো পৃথিবীর কোথাও অবিকৃতরূপে নেই। ইয়াহুদী খৃস্টানগণ এতে মনগড়া সংযোজন বিয়োজন করে বহু বিকৃতি করেছে। একমাত্র আমাদের নবী, সমগ্র সৃষ্টিকুলের নবী, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন করীম অবিকৃত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

আসমানী কিতাব ১০৪টি, প্রসিদ্ধ কিতাব চারটি ১০০টি হলো সহীফা, যথা আদম আলায়হিস্ সালামের উপর অবতীর্ণ ১০টি, হযরত শীষ আলায়হিস্ সালামের উপর ৫০টি, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালামের উপর ৩০টি, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের উপর ১০টি।

যুগে যুগে ইয়াহুদী খৃস্টানগণ সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন পরিমার্জন করে কিতাবের মূল অস্তিত্বকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনই অবিকৃত ঐশীগ্রন্থ হিসেবে যেমনটি নাযিল হয়েছিল তেমনি চিরকালই থাকবে। এর প্রতিটি আয়াত ও সূরা লক্ষ লক্ষ হাফিজে কুরআনের বক্ষে কিয়ামত অবধি সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন আমিই নাযিল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। [সূরা হিজর: আয়াত-১৪]

আল্লাহর কুরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ তথা আল হাদীস বিশ্ব মানব জাতির জন্য এক অসীম অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার। ইসলামের নবী বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কুরআনের প্রতিটি বিধান তাঁর পবিত্র জীবনে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর অনুসৃত জীবনাদর্শই আমাদের সার্বিক সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি কল্যাণ সাফল্য ও মুক্তির পাথেয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর হিদায়ত নসীব করুন। আমিন।

লেখক: অধ্যক্ষ- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

মাহে যিলক্বদ

'যিলক্বদ' আরবী বর্ষের একাদশ মাস। অন্যান্য মাসের মতো এ মাসেও নিম্নলিখিত ইবাদতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা যায়।

নামায

যিলক্বদ মাসের প্রথম রাতে এশার নামাযের পর চার রাক্'আত নফল নামায দু'সালামে পড়া যেতে পারে। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা-ই ইখলাস ২৩ বার করে পড়বেন। সালাম ফেরানোর পর নিজের গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাগফিরাত কামনা করবেন। ইন্শা-আল্লাহু তা'আলা এ নামাযের বরকতে আল্লাহ্ পাক তাকে ক্ষমা করবেন এবং হাশরের দিনে তার কপাল সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হবে। তাছাড়া, যিলক্বদ মাসের প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর দু'রাক্'আত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার করে পড়বেন। ইন্শা-অল্লাহু তা'আলা ওই নামায সম্পন্নকারীকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যেক রাতে উমরার সাওয়াব দান করা হবে। তাছাড়া, যিলক্বদ মাসের প্রত্যেক জুমু'আর নামাযের পর ৪ রাক্'আত নফল নামায দু'সালামে পড়বেন। প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ২১ বার করে পড়বেন। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ নামায সম্পন্নকারীকে ইন্শা-আল্লাহু তা'আলা, হজ্ব ও উমরার সাওয়াব দান করবেন।

নফল রোযা

যিলক্বদ মাসে যে কেউ যে কোন দিনে একটি রোযা রাখবে আল্লাহ্ পাক তাকে উমরার সাওয়াব দান করবেন। এ মাসের সোমবারে কেউ রোযা রাখলে সে অগণিত ইবাদতের সাওয়াব পাবে।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত কয়েকজন বুযুর্গ

১ যিলক্বদ: ইমাম গুনদর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

২ যিলক্বদ: মুফতি আমজাদ আলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১১ যিলক্বদ: আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১৯ যিলক্বদ: হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

২০ যিলক্বদ: হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

২৩ যিলক্বদ: আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

২৭ যিলক্বদ: হযরত আমীর হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

আগামী মাস মাহে যিলহজ্ব

এ মাসও শাহরুল হারাম এর অন্তর্ভুক্ত। হজ্ব, কোরবানী ও ঈদুল আজহার এ মহান মাসে অধিক হারে নফল ইবাদতে মশগুল থাকার চেষ্টা করা অপরিহার্য।

এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস ২৫ বার করে পড়লে বেশুমার সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

এ মাসের ১০ম রজনীতে বিতির নামাযের পর দুই রাক্'আত নফল নামায আদায় করবে এর প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাউসার তিনবার ও সূরা ইখলাস তিনবার করে আদায় করবেন।

এ মাসের যে কোন রাতের শেষ অধ্যায়ে প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস দ্বারা চার রাক্'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর দুহাত তুলে নিম্নের দো'য়াটি পড়বে।

সুবহানা যিল ইজ্জাতি ওয়াল জাবারূত, সুবহানা যিল কুদরাতি ওয়াল মালাকুত, সুবহানা যিল হাইয়্যিল লাজী লা-য়ামুতু, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ইউহয়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়াহুয়া হাইয়ূন লা-য়ামুত, সুবহানা রাব্বিল এবাদি ওয়াল বিলাদি, আল্হামদু লিল্লাহি কাসীরান তায়্যিবাম মুবারাকান আলা কুল্লি হাল। আল্লাহু আকবর কাবীরান, রাব্বানা ওয়া জাল্লা জালালুহু ওয়া কুদরাতাহু বিকুল্লি মকান।

এরপর আল্লাহ্র কাছে স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করলে, ইন্শা-আল্লাহ্ কবুল হবে। এ নামায ও দো'আর আমল একবার আদায় করলে হজ্ব ও মদীনা তাইয়্যিবায় জিয়ারতের সাওয়াব নসীব হবে।

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হুযূর-ই আক্‌রামের বেলাদত শরীফের সময় থেকে শয়তানগণ আসমানের নিকট যেতেই উল্কাপিন্ডের মার খেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সাথে সাথে আসমানও সংরক্ষিত হয়ে যায়। ইতোপূর্বে শয়তানগণ উড়ে গিয়ে প্রথম আসমানের কাছে পৌঁছে যেতো এবং চুপিসারে ফেরেশতাদের আলাপ-আলোচনা শুনে কিছু কথা চুরি করতে চেষ্টা করতো। তারপর সেগুলোর সাথে নিজেদের থেকে আরো কিছু মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে দুনিয়ায় এসে উভয় ধরনের কথা কাহিন বা গণকদেরকে বলে দিতো। গণকগণ তা মানুষের কাছে বলতো। অতঃপর ফেরেশতাদের ব্যক্ত ও তাঁদের থেকে শ্রুত কথাগুলো সত্য হতো আর শয়তানদের জুড়ে দেওয়া কথাগুলো মিথ্যা হতো। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হতো। এজন্য হাদীস শরীফে কাহিন বা গণকদের কাছে যাওয়াকে নিষিদ্ধ এবং তাদের কথা বিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমতরূপে বিশ্বনবী হুযূর-ই আক্‌রামের বেলাদত শরীফ হলে শয়তানদের জন্য আসমানের নিকটে যাওয়াও নিষিদ্ধ করা হলো; যাতে তারা ওই অপকর্মের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আসমানকে আসমান-রক্ষক ফেরেশতা নিয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা সংরক্ষণ করে ফেলেন। ফলে শয়তানগণ আসমানের নিকটে যেতেই তাঁরা তাদের দিকে আগুনের উল্কা পিন্ড নিক্ষেপ করেন। এর প্রচন্ড মার খেয়ে শয়তানরা যমীনের দিকে পালিয়ে আসে। ক্বসীদা বোর্দায় আল্লামা বূসীরী বলেন-কাফিরগণ হুযূর-ই আক্‌রামের রিসালতকে অস্বীকার করার পূর্বে আসমানের প্রান্তগুলো থেকে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড ছিঁড়ে পড়তে দেখতো। আর যমীনে বোতগুলোকে মাটিতে পতিত অবস্থায় দেখতো।

আল্লামা খরপূতী বলেন-

رُوِىَ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى اِذَا قَضٰى اَمْرًا كَانَ يَسْمَعُهٗ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيُسَبِّحُوْنَ فَسَبَّحَ مَنْ تَحْتَهُمْ اِلٰى السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَتَخْتَطِفُ وَتَسْتَرِقُهُ الشَّيَاطِيْنُ ثُمَّ يَاْتُوْنَ بِهِ الْكَهَنَةَ عَلَى الْاَرْضِ فَمَاجَآءُوْا به عَلٰى وَجْهٍ فَهُوَ حَقٌّ وَلٰكِنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ فِيْكَذِبُوْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا وُلِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتِ الشَّيَاطِيْنُ مَرْجُوْمِيْنَ مِنَ السَّمَآءِ وَمَمْنُوْعِيْنَ مِنَ الصُّعُوْدِ اِلَيْهَا بِنُجُوْمٍ وَنِيْرَانٍ تَرْمِيْهَا الْمَلٰئِكَةُ اِلَيْهِمْ

অর্থ: বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কোন হুকুম জারী করা হয়, তখন সেটাকে আরশবাহী ফেরেশতাগণ শুনে তাসবীহ্ পাঠ করেন, আর তাঁদের নিম্নবর্তী ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পড়েন। তখন অন্য ফেরেশতাগণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাঁদেরকে ওই হুকুম সম্পর্কে তাঁরা খবর দেন। এ পর্যন্ত যে, প্রথম আসমানের ফেরেশতাগণ পর্যন্ত এ খবর ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শয়তানরা, যারা প্রথম আসমানের নিকটে উড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, ওই খবরগুলো (যতটুকু শুনতে পেয়েছে) উড়িয়ে এনে গণকদেরকে বলে দেয়। তখন যতটুকু সঠিক খবর তারা দিতো তা একেবারে সঠিক হতো। কিন্তু তারা বেশীরভাগ সময় অতিরিক্ত কিছু মিলিয়ে বলতো। তা ডাহা মিথ্যা হতো। এ অবস্থা জাহেলী যুগ পর্যন্ত ছিলো।

যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্ম হলো, তখন থেকে শয়তানদের এ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো আর আসমানের রক্ষক ফেরেশতাদের উল্কাপিন্ড নিক্ষেপের ভয়ে শয়তানরা আসমানের নিকটে যেতো না। আর যারা যেতো তাদেরকে প্রজ্জ্বলিত তারকারাজি ও উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করে প্রচন্ড আঘাত করা হতো। সুতরাং ক্বোরআন-ই করীমেও এরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ يَّسْتَمِعُ الْاٰنَ يَجِدْلَه شِهَابًا رَصَدًا

তরজমা: অতঃপর এখন যে কেউ শুনতে চেয়েছে, সে আপন তাকের মধ্যে উল্কাপিন্ড পেয়েছে।

[সূরা জিন: আয়াত-৯, কানযুল ঈমান]

আরো এরশাদ হয়েছে-

وَجَعَلْنَاهَارَجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ

তরজমা: এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপ উপকরণ করেছি। [সূরা মূলক: আয়াত-৫, কানযুল ঈমান]

হুযূর-ই আক্‌রামের বেলাদত শরীফের সময় মূর্তিগুলো অধোমুখে পতিত হয়েছিলো। মূর্তিগুলো বুঝাতে যে 'সানাম' ও দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সে দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে-'ওয়াসান' (وثن) হচ্ছে যার দেহ আছে; চাই কাঠের হোক, অথবা পাথরের হোক; অথবা হোক স্বর্ণ কিংবা

রূপার। আর সামাম (صنم) ওই তাসভীর (ফটো বিশেষ)কে বলা হয়, যা পুরুত্ব বিশিষ্ট দেহবিহীন হয়। আল্লামা বুসীরীর পংক্তিতে صنم (সনম) ব্যবহৃত হয়েছে। তা এ জন্য যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের সময় সমস্ত 'সনম', যেগুলোর ছবি দেওয়ালের উপর অঙ্কন করা হয়েছিলো, সবক'টি মুখের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। আর وثن (দেহবিশিষ্ট বোতগুলো) তো অবশ্যই মুখের উপর উপুড় হয়ে পতিত হয়েছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওই অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারী মুশরিকরা হিদায়তের পথ থেকে এমন অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা আসমানের পার্শ্বগুলো থেকে উল্কাপিন্ড পড়তে দেখেও ঈমান আনেনি। আগুনের ওই উল্কাপিন্ডগুলো জিন ও শয়তানদেরকে মারা হচ্ছিলো। ওইগুলোর আঘাতের চোটে তারা এমনভাবে পতিত হতো, যেমন ভূ-পৃষ্ঠের উপর বোতগুলো মাথার উপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়েছিলো। এসব শান অস্বীকারকারীগণ স্বচক্ষে দেখেছে। আর হুযূর-ই আক্রামের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো থেকে একটি বড় নিদর্শন এও ছিলো যে, চুরি করে শোনার জন্য যেসব শয়তান আসমানের নিকটে যেতো তাদের উপর আগুনের শিখাগুলো পড়তো। আর আয়াতে বর্ণিত رَجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنَ-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। তাছাড়া বেলাদত শরীফের সময় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত বোত মুখের উপর উপুড় হয়ে পতিত হয়েছিলো।

সুতরাং খাজা আবদুল মুত্তালিবের ঘটনা আছে যে, তিনি যখন কা'বার বোতখানায় গিয়েছিলেন, তখন সমস্ত বোতকে মাথা নিচের দিকে উপুড় অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। আর হুবল বোতের মুখের এ চতুর্পদী কবিতা শুনতে পেয়েছিলেন-

تَرى بِمَوْلُدٍ اَضَاءَتْ بِنُوْرِه ـ جَمِيْعُ فَجَاجَةِ الْاَرْض
مِنْ شَرْقٍ وَمِنْ غَرْبٍ
وَخَرَّتْ لَهُ الْاَوْثَانُ طَرًّا وَارْعَدَتْ ـ قُلُوْبَ مُلُوْكِ
الْاَرْض جَمْعًا مِنَ الرُّعْبِ

অর্থ: হে আবদুল মুত্তালিব! তুমি ওই সৌভাগ্যবান নবজাতের সাক্ষাৎ পেয়েছো, যাঁর নূরের আলোতে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিটি প্রান্ত ও অংশ আলোকিত হয়ে গেছে। আর সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের বোতগুলো মাথা নিচু করে ফেলেছে। আর বাঁকাটুপি পরিহিত বাদশাহদের হৃদয়গুলো তাঁর ভয়ে কাঁপছে।

এদিকে বেলাদত শরীফের রাতে ইরান-সম্রাট কিসরার রাজ প্রাসাদে এমন ভূকম্পন আরম্ভ হয়েছিলো যে, সেটার চৌদ্দটা কঙ্কর খসে পড়েছিলো, অগ্নিপূজারীদের অগ্নিকুন্ড, যা হাজারো বছর ধরে জ্বলছিলো, নিভে গিয়েছিলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের 'সাওয়া-সাগর' শুষ্ক হয়ে গিয়েছিলো। কিসরা (পারস্য সম্রাট) তাতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। সে সমস্ত নজূমীকে ডেকে সমবেত করে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলো। সবাই এর কারণ উদ্ঘাটন করতে অপরাগতা প্রকাশ করেছিলো। শেষ পর্যন্ত ইরান-সম্রাট ইয়ামনের গভর্ণর বাযানের নিকট চিঠি লিখেছিলো যেন শীঘ্র দক্ষ নজূমী প্রেরণ করে। সুতরাং সে আবদুল মসীহ্ ইবনে ওমর ইবনে বুক্বায়লাহ্ গাস্সানীকে প্রেরণ করেছিলো। সে কিস্রার নিকট থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে বলেছিলো, "এ মামলার ফয়সালা আমার মামা সায়ত্বাহ্ কাহিন (সায়ত্বাহ্ নামক গনক), যে সিরিয়ায় থাকে, দিতে পারে। আমি এ সম্পর্কে নিজের কোন মতামত ব্যক্ত করতে পারছিনা। সুতরাং বাদশাহ্ (ইরান সম্রাট) তাকে সেখানে পাঠিয়েছিলো। যখন সে সায়ত্বাহর নিকট আসলো তখন তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় পেয়েছিলো। সে তাকে অভিভাদন জানালো। তখন সে মাথা তুলে বললো, "হে আবদুল মাসীহ্! তুমি উটের উপর সাওয়ার হয়ে আমি সায়ত্বাহর নিকট এমন সময় এসেছো, যখন তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাচ্ছে। হে আবদুল মসীহ্! সাসানী বাদশাহ্ তোমাকে তার রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হওয়া, অগ্নিপূজারীদের অগ্নিকুন্ড নির্বাপিত হওয়া ইত্যাদির কারণ জানার জন্য পাঠিয়েছে। হে আবদুল মসীহ্! যখন 'সাওয়া-সাগর' শুষ্ক হয়ে গেছে, সামাওয়া উপত্যকা সবুজ সজীব হয়ে গেছে, তখন নিঃসন্দেহে সাহেবুত্ তিলাওয়াত, শেষ যামানার নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট দ্বীন প্রকাশ পাবে। রাজ প্রাসাদ থেকে পতিত কঙ্করগুলোর সংখ্যানুসারে ততজন বাদশাহ্ সাসানের বাদশাহীতে টিকে থাকবে। অর্থাৎ এ বংশে আর মাত্র চৌদ্দজন বাদশাহ হবে। এর পর যা হবার তা-ই হবে। এরপর সায়ত্বাহ্ নজূমীর রূহ দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। আবদুল মাসীহ এসব কথা কিসরাকে শুনালো। তার মনে বহুগুণ প্রশান্তি পেলো। সে মনে করেছে একের পর এক করে চৌদ্দজন সম্রাট অতিবাহিত হতে অনেক সময় লেগে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, মাত্র চার বছরের মধ্যে দশজন বাদশাহ্ খতম হয়ে গেছে। আর যে চারজন অবশিষ্ট

ছিলো, তারাও হযরত আমীরুল মু'মিনীন ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে খতম হয়ে গেছে।

হযরত সাওয়াদ ইবনে ক্বা-রিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি গনক ছিলাম। আর জিন আমাকে খবর দিতো হুযূর-ই আক্রামের বেলাদত শরীফের সময় সে আমাকে বললো, "এখন থেকে আমরা তোমাকে খবর দিতে পারবো না। কারণ আমরা এখন আসমানের উপর যখনই যাই, তখন আমাদের উপর উল্কাপিন্ড এসে পড়ে। সুতরাং এখন থেকে তুমিও এ কাজ (গণনা) ছেড়ে দাও এবং ওই মহান পথ প্রদর্শকের সন্ধান করো, যিনি বনী লুআই ইবনে গালিবের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছেন। তিনি আল্লাহর সৃষ্টিকে হিদায়তের পথে ডাকেন; বোত পূজা করতে নিষেধ করেন।"

তিনি (হযরত সাওয়াদ) বলেন, আমি একবার/দু'বার পর্যন্ত তার (জিনটি) কথায় কোন পরোয়া করিনি। যখন সে তৃতীয়বারও একই কথা বলেছে। তখন আমার মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসাও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং আমি মক্কা মু'আয্যামায় হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

লেখক: মহাপরিচালক - আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

বিশ্বব্যাপি সুন্নিয়তের জাগরণে শাহানশাহ্ এ সিরিকোট

[রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

গাউসে জামান, সৈয়্যদুল আউলিয়া,পেশওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি, পেশোয়ারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, কালে কালে কখনো 'আফ্রিকাওয়ালা পীর', কখনো 'সীমান্ত পীর', কখনো 'পেশওয়ারী সাহেব', শেষের দিকে 'সিরিকোটি হুজুর', এমনকি চট্টগ্রামে শুভ আগমনের শুরুতে 'ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পীর' হিসেবেও অভিহিত হতেন। এই ক্ষণজন্মা মহান সংস্কারক অলীই এই নিবন্ধে 'শাহানশাহ্ এ সিরিকোট' উপাধিতে আলোচিতব্য। আজ বাংলাদেশ'র সুন্নি অঙ্গনে এই 'শাহানশাহ্ এ সিরিকোট' একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম, একটি জাগরণী শ্লোগান। শাহানশাহ্ এ সিরিকোট'র জন্ম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বর্তমান খাইবার পাখতুন প্রদেশের বিখ্যাত মাশওয়ানি, 'সৈয়্যদ' অধ্যুষিত 'সিরিকোট' পার্বত্য অঞ্চলের শেতালু শরিফে ১৮৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বা তারও কয়েকবছর আগে। তিনি বংশ পরম্পরায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩৮তম অধস্তন বংশধর।

[শাজরা শরীফ, প্রকাশনায়, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট]

ইমাম হোসাইন (রা)'র পঞ্চম অধস্তন বংশধর সৈয়্যদ জালাল আর রিজাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদিনা পাক ছেড়ে ইরাকের 'আউস' এ চলে আসেন। পরবর্তিতে তাঁর ৫ম অধস্তন বংশধর মীর সৈয়্যদ মুহম্মদ গেসুদারাজ সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সময়ে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আফগানিস্তান হিজরত করেন, এবং তাঁর সাথে ভারত অভিযানেও শরীক হন। আফগান-বেলুচিস্তানের সীমান্তের 'কোহে সোলাইমানি'তে তিনি শায়িত আছেন, যে জায়গাটি সুলতান গজনবীর উপহার হিসেবেই তিনি লাভ করেন, এবং এখানে বসেই তিনি মুলতান পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়ে ৪২১ হিজরিতে ওফাত বরণ করেন, আর এই সময়টা ছিল খাজা গরীব নওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ভারত আগমনের দুইশ বছর আগে। এ গেসুদারাজ (আউয়াল)'রই ১২ তম অধস্তন পুরুষ হলেন সিরিকোট বিজয়ী, ফাতেহ্ সিরিকোট সৈয়্যদ গফুর শাহ্ ওরফে কাপুর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। [Local govt. Act: (Ref-15) Hazara 1871]

তিনি আফগানের কোহে সোলাইমানি হতে হিজরত করে উত্তর- পশ্চিম সীমান্তের কোহে গঙ্গরে আসেন এবং অত্যাচারী শিখ রাজাদের প্রতিহত করে যে এলাকাটি ইসলামের জন্য আবাদ করেন এর বর্তমান কেন্দ্রস্থল 'সিরিকোট'। 'সের' মানে মাথা, আর কোহ্ 'হল পাহাড়। 'সেরকোহ' মানে 'পাহাড়ের চূঁড়া' বা পাহাড় শীর্ষ। এই ইসলাম বিজয়ী বীর হযরত সৈয়্যদ গফুর শাহ্ ওরফে কাপুর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি গঙ্গর পাহাড়ের একদম মাথায় বসবাস করতেন বিধায় তাঁর আবাস বুঝাতে 'সেরকোহ্ শব্দটি ব্যবহার হয়, এবং কালের বিবর্তনে মানুষের মুখে শব্দ পরিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় বর্তমানে এ এলাকা 'সিরিকোট' হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ফাতেহ্ সিরিকোট সৈয়্যদ গফুর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ১৩ তম অধস্তন পুরুষ হযরত সৈয়্যদ সদর শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ই শাহজাদা হলেন এই প্রবন্ধে আলোচিত শাহানশাহ্ এ সিরিকোট, আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি, পেশোয়ারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

[শাজরা শরীফ, প্রকাশনায়, আনজুমান -এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট]

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার এই মহান দিকপাল শুধু কাদেরিয়া ত্বরিকাকে নয়,এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে ভ্রমন করে সুন্নিয়ত কেও পূনর্জাগরিত করেছিলেন তাঁর শতাধিক দীর্ঘ হায়াতে তাইয়্যেবাকে কাজে লাগিয়ে। তাই আজ বাংলাদেশ-বার্মা, আফ্রিকা-পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বহুদেশ-জনপদে একটি আদর্শ, একটি প্রেরণার নাম হলেন শাহানশাহে সিরিকোট রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

ক. শিক্ষা-দীক্ষা

ঐতিহ্যগত উন্নত পারিবারিক শিক্ষা, তালিম, তারবিয়তের পাশাপাশি তিনি ছিলেন পরিত্র কোরানে করিমের হাফেজ। কোরান, হাদিস, উসুল-ফেকাহ্ ইত্যাদি দ্বীনিয়াত বিষয়ে শিক্ষা তিনি স্থানীয় জেলা সহ ভারত-পাকিস্তানের বিভিন্ন মদ্রাসার উপযুক্ত ওস্তাদগন থেকে আয়ত্ব করেন। লিখিত সনদ অনুসারে, ১২৯৭ হিজরির শা'বান মাসে তাঁকে 'মমতাজুল মুহাদ্দেসীন' সনদ প্রদান করে দস্তারে ফজিলত অর্পন করা হয়। যা ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রদান করেন। তাঁর ত্বরিকত জীবনের দীক্ষা গুরু ছিলেন হরিপুরের বিখ্যাত কামেল অলী, গাউসে দাঁওরা, খলিফায়ে শাহে জীলাঁ, খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী আল আলাভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

[শাজরা শরীফ, প্রকাশনায়, আনজুমান -এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট]

১৯১২ তে, আফ্রিকা হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শত শত বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার এমন কামেল মুর্শিদের হাতে বয়াত গ্রহণ করে ত্বরিকত জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁর পীর খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র আধ্যাত্মিক মর্যাদার অনুমান সাধারণের জন্য সাধ্যাতীত। যিনি প্রাতিষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক কোন প্রকারের শিক্ষার্জনের সুযোগ লাভ করতে পারেননি, অথচ তাঁর অদৃশ্য আধ্যাত্মিক 'ইলমে আতায়ি' দিয়ে রচনা করে গেছেন ১৮ টি কিতাব। এর একটি কিতাব হল ৩০ পারা বিশিষ্ট দরুদ গ্রন্থ 'মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম', যা বড় বড় আল্লামাদের পর্যন্ত আক্বল হয়রান হবার মত একটি কিতাব। দুনিয়ার বুকে কোরান শরিফ, বোখারি শরিফের পর এটিই তৃতীয় ৩০ পারা কিতাব যা মাকসাদ হাসিল ও বরকতের জন্য খতম দেওয়ার রেওয়াজ চালু আছে। বিশুদ্ধ আরবীতে রচিত এ অনবদ্য দরুদ গ্রন্থের একটি কপি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের এক আরব পাঠকের নজরে আসবার পর, তিনি কিতাবটির মলাটে আরবিতে একটি মন্তব্য লিখে যান যে, "এটা কখনো কোন অনারবের রচনা হতে পারেনা"। উল্লেখ্য, যেহেতু এ বিরল দরুদ গ্রন্থের লেখক খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পরিচয় হল তিনি পাকিস্তানের হরিপুর জেলার বাসিন্দা, একজন অনারব। অর্থাৎ অনারবের পক্ষে এত উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষার কিতাব রচনা কখনও সম্ভব হবার কথা না।

খ. ইসলামের মূলধারা 'সুন্নিয়ত'

কোরান-সুন্নাহ্, এজমা-কেয়াস এবং মাজহাব ও সূফিবাদের সুসামন্জস্যপূর্ণ বিশ্বাস ও আমলই মূলত সুন্নিয়ত। এটাই ইসলামের মূলধারা। এ আক্বিদা-আমলের মুসলমানরাই সুন্নি মুসলমান। সুন্নি মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, শুধু শরিয়তের অনুসরণ সফলতার জন্য যথেষ্ট নয়, দরকার তাসাওফের পথ ত্বরিকতও। আবার শরিয়ত বাদ রেখে শুধু ত্বরিকত-মারেফাত চর্চা সুন্নিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবিতর্কিত আদর্শের অনুসারী সফল পুরুষগণের মধ্যে হযরত গাউসুল আযম জিলানী, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, শেহাবুদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী, বাহাউদ্দিন নক্সবন্দী, মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পথ ও মত কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, নক্সবন্দীয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত। উক্ত মূল ত্বরিকত দর্শনের অনুসরণে এবং সিলসিলাহ্ পরম্পরায় পরবর্তিতে আরো কিছু ত্বরিকত দর্শন আত্মপ্রকাশ করলেও প্রথমোক্ত চারটিই বিশ্বব্যাপি বহুলভাবে সমাদৃত ও পরিচিত। উল্লেখ্য, ত্বরিকত সমূহের উক্ত মূলধারার অপর নামও কিন্তু সুন্নিয়ত। যদিও এসব ধারার অনুসারী দাবিদারদের মধ্যে ইদানিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিয়া ও ওহাবী মতবাদের আক্বিদা-আমল ও আচরণ লক্ষ্যণীয়। এরপরও, সহজভাবে আমরা সুন্নি বলতে বুঝব কোরান-সুন্নাহ্ -এজমা, কেয়াস-মাজহাব-ত্বরিকতে বিশ্বাসী ও অনুসারী বৃহত্তর ইসলামি জনগোষ্ঠীকে। এরাই, হাদিস শরীফে নির্দেশিত একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'। যাদের পরিচয় হল "মা আনা আ'লাইহি ওয়া আসহা-বি।"

[আল হাদিস]

গ.বিশ্বব্যাপি সুন্নিয়ত প্রচারে শাহানশাহ্ এ সিরিকোটের কর্মযজ্ঞ

হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতার ইতি টানবার পর থেকেই নিজেকে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত করে দ্বীনি শিক্ষাকে কাজে লাগাতে শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অবদান এ প্রবন্ধের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় সংক্ষেপে তুলে ধরলামঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার

১৮৮০-১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, তিনি প্রথমে আপন মাশওয়ানি সৈয়্যদ বংশের এক তাপসী নারীর সাথে

পারিবারিক ঐতিহ্যানুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, এরপরই কোন এক সময়ে ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে পূর্বপুরুষ আহলে বাইতগণের পথ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছুটে যান ইসলাম প্রচারের কাজে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন, মোম্বাসা ও জাঞ্জিবারের বিভিন্ন জনপদে তাঁর হাতে অসংখ্য স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে। Dr Ibrahim M Mahdi, মাহদি লিখিত A short history of Islam in South Africa গ্রন্থের স্বীকৃতি অনুযায়ী এ সব অঞ্চলের ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সফলকাম প্রচারক হলেন সৈয়্যদ আহমদ পেশওয়ারী নামক একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। উল্লেখ্য, পাকিস্তান অর্জনের আগেকার ঐ সময়ে সিরিকোটি হুজুর ভারতীয় হিসেবেই পরিচিত হবার কথা। আর তিনি ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি সুন্নতি পেশা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আফ্রিকার একজন শীর্ষ ব্যবসায়ী হিসেবেও গণ্য হতেন। পরবর্তিতে, ১৯১১ সনে, তাঁর নিজের অর্জিত অর্থে আফ্রিকার প্রথম জামে মসজিদটি তাঁর হাতেই নির্মিত হয়।

[Dr.Ibrahim M Mahdi,প্রাগুক্ত]

পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থেও সিরিকোটি হুজুরের আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়।

[প্রফেসর ড. মাসউদ আহমদের ইফতিতাহিয়্যা, মুফতী আবদুল কাইয়্যুম হাযরাভী, আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী, আল্লামা সৈয়দ আমির শাহ্ গীলানী, ড. মমতাজ আহমদ ছদিদীসহ বিভিন্ন স্কলারদের কিতাব]

বিশেষত, তাঁর বড় নাতি, দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোট শরিফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন হযরত, আল্লামা সৈয়্যদ মুহম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিলুহুল আলিও একবার অধম প্রবন্ধকারের জিজ্ঞেসে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ জামে মসজিদের দেখভাল করার দায়িত্ব অদ্যাবধি তাঁর নানার বংশের আত্মীয়দের হাতে রয়েছে। সিরিকোটি হুজুরের সহোদর ভাই সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ্ ১৯১১ সালে স্বপরিবারে উক্ত মসজিদসহ দ্বীনী মিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় হিজরত করেন।

[অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান, সুন্নিয়তের নবদিগন্ত উন্মোচনকারী পথিকৃত, হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহ. তরজুমান যিলক্বদ সংখ্যা ১৪৩৯ হিজরী]

উল্লেখ্য, হুজুর কেবলা তাহের শাহ্'র দাদা সিরিকোটি শাহ্ এবং নানাজি সৈয়দ ইউসুফ শাহ্ সম্পর্কে আপন ভাই হন। সৈয়্যদ বংশের পবিত্র রক্তধারার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে তাঁদের সব আত্মীয়তা নিজেদের মধ্যেই এ পর্যন্ত হয়ে আসছে।

পীরের দরবারে নজিরবিহীন খেদমত

আফ্রিকা থেকে ফিরে তিনি তাঁর পীর খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দরবারেই কাটিয়ে দেন প্রায় ৭-৮ বছর। সেখানেও তিনি বিরল স্বাক্ষর রেখেছেন দরবারের সেবায়। পীরের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটিও বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁর মহীয়সী বিবির উপুর্যপরি পরামর্শ এবং পীড়াপীড়িতেই তিনি খাজা চৌহরভীর সাথে সাক্ষাতে কোনমতে রাজি হন, এবং সেই এলাকার হরিপুর বাজারে কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন। হরিপুর থেকে সিরিকোটের দুরত্ব অন্তত ১৮ মাইল। দোকান খোলার কয়েকদিন পর, আসা-যাওয়ার পথেই একদিন হয়ে গেল সেই তাৎপর্যপূর্ণ মিলনপর্ব। এ সময় সিরিকোটি হুজুরের এক লোকের নুরানি সূরতের দিকে দৃষ্টি গেল, যাঁকে খুব কর্ম ব্যস্ত মনে হচ্ছিল। ভাবছিলেন, বোধহয় উনিই হবেন, তাঁর বিবির বর্ণিত সেই পীর। সামনাসামনি হতেই তাঁকে সালাম দিলেন, আর পীর সাহেবের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর এল অনেক লম্বা এবং বিশেষ স্বরভঙ্গিতে, যেন তাঁর সেই স্বরভঙ্গি জানান দিচ্ছিল ''ও তুমিই তাহলে,এসেছ শেষতক -ঠিক আছে, আমারও যে দরকার তোমাকে''। পীরজি সালামের তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর শুধু দিলেন না, এবার জিজ্ঞেস করলেন, "চান্দে কেত্তে আয়ে", হে চাঁদপুরুষ আপনি কোত্থেকে আসছেন? সিরিকোটি হুজুর উত্তর দিলেন, গঙ্গর সে'-গঙ্গর উপত্যকা হতে। আবার জিজ্ঞেস, এখানে কেন? উত্তর দিলেন, ''আমি হরিপুর বাজারের নতুন দোকানদার''। পীরজি বল্লেন, ও তাই নাকি, বেশ ভাল কথা, আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের বলব যে, হরিপুরে আমার একটা দোকান আছে, যেন তারা আপনার কাছ থেকে কিনে ''কী আশ্চর্য, প্রথম দেখাতেই যেন শত বছরের আপনজন, পর বলে মনে হচ্ছিলনা চৌহরভী হুজুরকে। এবার সিরিকোটি হুজুর জানতে চাইলেন, হযরত আপনাকে খুব তৎপর দেখাচ্ছে, কী করছিলেন? বললেন, একটা মসজিদ নির্মানের কাজে ব্যস্ত আছি''। সিরিকোটি সাহেব বললেন, তাই নাকি? তাহলে মেহেরবানি করে আমাকেও এমন মোবারক কাজে শরিক করুন, এই বলে, হযরত চৌহরভী'র হাতে তিনি তুলে দেন একশত টাকা, সুবহানআল্লাহ! ঘটনাটি আনুমানিক ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময়ে, আর সে সময়ে একশত টাকা তাৎক্ষনিক দানের ঘটনা কল্পনাতীত। শুধু চৌহর শরিফের উক্ত মসজিদ নয়, সিরিকোটি হুজুর নিজের টাকায় আরো বহু মসজিদ তৈরী করেন, এর মধ্যে

একটি হরিপুর বাজারে রয়েছে। তাছাড়া নিজ বাড়ি সিরিকোট দরবারের জামে মসজিদটিও তাঁর টাকায় নির্মিত হয় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে। বিশেষ করে, ১৯০২ সনে চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হরিপুর বাজারে যে "দারুল উলুম ইসলামিয়া রহমানিয়া" প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা মূলত সিরিকোটি সাহেবের হাতেই বিশাল মারকাজ হিসেবে পূর্ণতা পায়। তিনি এই মাদরাসার আর্থিক পৃষ্টপোষকতায় শুধু প্রধান ছিলেননা বরং খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পর এর পরিচালনাটা পরিপূর্ণভাবে তাঁর উপরই নির্ভরশীল হয়। মাদরাসার বিশাল দ্বিতল ভবন (১৯২৭ খ্রি.) সহ পরবর্তী সকল উন্নয়ন ও প্রশংসনীয় অবস্থান ছিল তাঁর অবদান।

উল্লেখ্য, ৩১ডিসেম্বর ১৯৪৮ তৎকালিন অবিভক্ত পাকিস্তানের মন্ত্রী এবং গভর্নর সর্দার আবদুর রব নিশতার এ মাদরাসার অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন। "এই দারুল উলুমের মাধ্যমে এমন কামেল ব্যক্তি তৈরী হয়েছে যে যাঁদের পদচুম্বনে রয়েছে পরকালের মুক্তি" (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আ'লা হযরত গবেষক, প্রফেসর ড: মাসউদ আহমদ লিখিত ইফতিতাহিয়্যা) ২২ মার্চ ১৯৪৯ পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁনও এ মাদ্রাসার অবদান স্বীকার করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দরবারের লঙ্গরখানা এবং এই রহমানিয়া মাদরাসার হোস্টেলের রান্নাবান্নার জন্য লাকড়ির অভাব ছিল বলে, তিনি নিজ বাড়ি সিরিকোটের পাহাড় হতে সারাদিন লাকড়ি যোগাড় করতেন এবং দিন শেষে ১৮ মাইল দুরের চৌহর শরিফে নিয়ে যেতেন নিজের কাঁধে করে। এভাবে বহুবছর তিনি এমন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম পর্যন্ত করেছিলেন দরবার ও মাদরাসার সেবায়। এর ফলে তাঁর হাতে -ঘাঁরে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল এর যন্ত্রনা এবং চিকিৎসা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত চলেছিল। এই ক্ষত সম্পর্কে তিনি বলতেন-ইয়ে মেরে বাবাজিকা মোহর হ্যায়"। দ্বীনি খেদমতে কঠিন পরিশ্রমী এই জবরদস্ত আলেম-হাফেজ সিরিকোটি হুজুরের মধ্যেও এক সময়ে লোকালয় ছেড়ে বনে জঙ্গলে একান্তে রেয়াজত করবার ইচ্ছা জেগেছিল এবং এ জন্য পীরের এজাজতও চেয়েছিলেন, কিন্তু পীর খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, বন জঙ্গলের কঠিন রেয়াজাত-মোশাহেদা-মোজাহেদার চেয়েও উত্তম হল মানুষের মধ্যে থেকে দ্বীনের খেদমত করা"। সুতরাং সংসার -লোকালয় বর্জনে তিনি ব্যর্থ হবার পর, এবার তিনি চেয়েছিলেন লাহোর বাদশাহী জামে মসজিদের ইমাম -খতিবের দায়িত্ব পেতে। দরখাস্তও করেছিলেন কিন্তু এবারও পীর সাহেব একমত হলেন না। কারণ, ঐ মর্যাদাপূর্ণ পদে ইতোপূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর এক শাহজাদা এ পদের জন্য আবেদন করেছেন, খাজা চৌহরভী চেয়েছিলেন যে, দায়িত্বটা মরহুম ইমামের সন্তানের হাতে থাকুক। তাই, হযরত সিরিকোটি, তাঁর পীরের এক তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশে প্রেরিত হলেন রেঙ্গুনে। তাঁর কামেল পীর ছিলেন গাউসে দাঁওরান, খলিফায়ে শাহে জীলান তিনি তাঁর রুহানি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন হযরত সিরিকোটি হুজুরের হাতে রেঙ্গুন আর চট্টগ্রামের এক যুগান্তকারী দ্বীনি খেদমত সুন্নিয়তের মহাজাগরণের সুসংবাদ। ১৯২০ সালে, তিনি পীরের নির্দেশে স্বদেশের মায়া ছেড়ে দ্বীনের মায়ায় আবারো হিজরত করলেন রেঙ্গুনে।

রঙ্গিলা রেঙ্গুনের আঁধার তাড়াতে, সিরিকোটি এলেন মশাল হাতে

বার্মার রঙ্গিলা শহর রেঙ্গুনে হুজুরের আগমন ১৯২০ খ্রি.। তখন তাঁর বয়স ছিল কমপক্ষে তেষট্টি। পীরের নির্দেশ আর ইসলাম প্রচারের নেশা তাঁকে এই বয়সেও বিদেশ সফরে বাধ্য করল। এখানে তিনি ছিলেন ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট ২১-২২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি তৎকালিন বার্মার হাজার হাজার অমুসলিমকে যেমন মুসলমান বানিয়েছেন, তেমনি অসংখ্য বিপদগামি মুসলমানদের বানান সাচ্চা আক্বিদার পরহেজগার বান্দা।

[১৯৩৫ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বিদায়ী সংবর্ধনার মানপত্র, রচনায়- তফজ্জল হক, সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, আনজুমানে শুরা-ই রহমানিয়া রেঙ্গুন ১৬ অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে]

অনেক ভাগ্যবান বান্দা তাঁর তা'লিম তারবিয়তের ফলে হয়েছিলেন ইনসানে কামেল অলি-আউলিয়া। জানা যায়, শুরুতে তিনি ক্যাম্পবেলপুরে মাওলানা সুলতানের মাদরাসায় এবং পরবর্তিতে রেঙ্গুনের বিখ্যাত বাঙ্গালি সুন্নি জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই বিখ্যাত মসজিদই ছিল তাঁর সুন্নিয়ত প্রচারকেন্দ্র-যা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৪১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিখ্যাত আ'লা হযরত গবেষক প্রফেসর ড: মাসউদ আহমদ, আনজুমানে শুরায়ে রহমানিয়ার ১৯৩৫ সনের রিপোর্টের তথ্যানুসারে জানান যে, পীরের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে

হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯২০-৩৫ পর্যন্ত ১৬ বছর একাধারে রেঙ্গুনে থেকে যান, একটি বারের জন্যও স্বদেশে আপনজনদের কাছে যাননি। যদিও এই সময়ের মধ্যে ১৯২৪ সনের ৫ জুলাই তাঁর মহান পীর খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ৩ শাবান ১৯২৮ তারিখ বুধবারে তাঁর বড় শাহজাদা মৌলানা সৈয়্যদ মুহম্মদ সালেহ্ শাহ্ ওফাত প্রাপ্ত হন (ইফতিতাহিয়্যা)। অবশ্য, এ সংক্রান্ত একটি কারামতের কথা জানা যায় হুজুর কেবলার প্রবীণ মুরীদদের কাছ থেকে, যা ড: মাওলানা সাইফুল ইসলামের একটি রচনায়ও স্থান পেয়েছে। সে অলৌকিক ঘটনানুসারে, হুজুর কেবলা সিরিকোটি, ঐদিন ৩ শা'বান, বুধবার আসরের নামাজের সময়ে, বা নামাজের পরে হঠাৎ করে নিজের হুজরার দরজা বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ বের হননি। তখন তিনি তাঁর অসুখ বলে বলেছিলেন। কিন্তু ঐ দিকে সিরিকোট শরিফে একই সময়ে অনুষ্ঠিত তাঁর বড় শাহজাদার নামাজে জানাজায় তাঁকে দেখা যায়, সুবহানআল্লাহ। [সূত্র, তরজুমান]

উল্লেখ্য, খাজা চৌহরভী তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন ৩০ পারা দরুদ গ্রন্থ ছাপানোর কাজ এবং দারুল উলুম রহমানিয়ার কোন বিহীত না করে রেঙ্গুন না ছাড়েন। আর, এ জন্যই তিনি ১৬ বছর পরই স্বদেশে যান। আর, এরি মধ্যে তিনি ১৯৩৩ সনে এতবড় বিশাল ৩০ পারা কিতাব রেঙ্গুনে থেকেই প্রথম প্রকাশ সম্পন্ন করেন, এবং রহমানিয়া মাদরাসার দ্বিতল ভবন তৈরী করেন। এমনকি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসনের এবং শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থাটাও তিনি রেঙ্গুন থেকে করেন, আর এমন বিরল খেদমতে সে সময়েও অংশগ্রহণের সুযোগটা হয়েছিল রেঙ্গুন প্রবাসী চট্টগ্রামের মুসলমানদের।

রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামে, আনজুমান-জামেয়ার মিশন শুরু

১৯২০ থেকে ১৯৪১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বছরে রেঙ্গুনের হাজার হাজার স্থানীয় বার্মিজ নাগরিক এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসে কর্মরত প্রবাসীদের মধ্যে অসংখ্য অমুসলিম-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁর আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক আকর্ষণে উপকৃত হয়েছিলেন। এদের কেউ ভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলামে আবার কেউ অন্ধকার জীবন থেকে আলোর দিকে ফিরে এসেছিলেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত বাঙালী মসজিদের ইমামত ও খেতাবতের পাশাপাশি রেঙ্গুনসহ সমগ্র ব্রহ্মদেশে সত্যিকারের দ্বীন ও তরীক্বতের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন যা এখনো পর্যন্ত সেখানে বিদ্যমান। এ সময় সমগ্র রেঙ্গুনে তাঁর অসংখ্য কারামাতের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং দলে দলে লোকজন তাঁর কাছে এসে দুনিয়া-আখিরাতের অমূল্য নিয়ামত লাভে ধন্য হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বি মুজাহিদ আলেমে দ্বীন, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আযীযুল হক শেরে বাঙালা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রেঙ্গুন সফরের সময় কুতুবুল আউলিয়া, গাউসে যামান আল্লামা শাহ্ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে লোকজনের কাছে জানতে পেরে বাঙালি মসজিদে গিয়ে তাঁর সাথে মুলাক্বাত করেন এবং দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের পর তাঁর মধ্যে বিশাল বেলায়তী ক্ষমতা অবলোকন করে তিনি তাঁকে চট্টগ্রামে তাশরীফ আনার জন্য অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের সংবাদ পত্র শিল্পের পুরোধা দৈনিক আজাদী'র প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার আবদুল জলিলসহ চট্টগ্রাম নিবাসী তাঁর অসংখ্য মুরীদের আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করতে না পেরে ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি রেঙ্গুন থেকে পাকিস্তান যাওয়ার পথে চট্টগ্রামে কিছু দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করতেন। এ কয়েক দিনের যাত্রা বিরতিতে তাঁর আদর্শ, আখলাক ও অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে এখানকার মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে এবং এখানে তাঁর মুরীদ'র সংখ্যা বাড়তে থাকে দিন দিন।

এভাবে, ১৯৪১ এর শেষ দিকে এসে তিনি রেঙ্গুন থেকে স্থায়ীভাবে এই মিশন নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং বার্মা ছিল তখনো অক্ষত। কিন্তু আল্লাহর এ মহান অলী হযরত সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অলৌকিক অদৃশ্য শক্তিতে দেখলেন যে, শিগগিরই রেঙ্গুন শহর বোমা হামলায় তছনছ হয়ে যাবে এবং অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটবে। তিনি তাঁর মুরীদ এবং পরিচিত সকলকে দ্রুত রেঙ্গুন ত্যাগের নির্দেশ দেন এবং নিজেও রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে রেঙ্গুনে বিদ্যমান গাউসে জমান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর খলিফা হাজি ইসমাঈল বাগিয়া সাহেব জানান যে, তাঁর আব্বা হাফেজ মুহাম্মদ দাউদ জী বাগিয়া উক্ত নির্দেশ পেয়ে ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে তাদের পুরো

পরিবার নিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে লক্ষনৌতে নিজ দেশে ফিরে আসেন। অন্যান্যরাও চলে যান যার যার দেশে। আর ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে রেঙ্গুন শহরে বোমা বর্ষণ শুরু হয়।

[মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, সিরিকোট থেকে রেঙ্গুন দ্রষ্টব্য]

অপর একটি বিশ্বস্থ সূত্রে জানা যায় যে, শেষের দিকে হুজূর কেবলা সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রেঙ্গুন ছাড়বার সময় তাঁর খাদেম ফটিকছড়ি নিবাসী মরহুম ফজলুর রহমান সরকারকে রেখে আসেন হুজূর কেবলার বিছানায়। তাঁকে হুজুর কেবলা আরো তিন দিন থাকার পর রেঙ্গুন ছাড়ার পরামর্শ দেন। ফজলুর রহমান সরকার নির্দেশমত তিন দিন থেকে চলে আসেন এবং এর পরপরই বোমা বর্ষণ শুরু হয়। যারা হুজূর কেবলার নির্দেশ মেনে এবং বিশ্বাস করে রেঙ্গুন ছেড়েছিল তাদের সকলের প্রাণ বেঁচে যায় এবং সম্পদও রক্ষা পায় অনেকাংশ। আর অন্যদের অবস্থা হয় বিপরীত ধরণের। শেষ পর্যন্ত সকলকেই রেঙ্গুন ছাড়তে হয়েছিল যুদ্ধের ভয়াবহতা শুরু হবার পর, কিন্তু তাদের কেউ আর স্বাভাবিক এবং সুস্থভাবে দেশে ফিরতে পারেনি। হেটে হেটে আসবার সময় অনেকে পথিমধ্যেই ক্ষুধায় এবং শক্তিহীন হয়ে মারা যান।

যা হোক, তাঁর রেঙ্গুন জীবনের শুরুতে ১৯২৪ সালের দিকে তাঁর পীর খাজা চৌর্হভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে শরীয়ত-তরীক্বতের বিশাল দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদান করে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন। পীরের ইন্তিকালের পরপরই তিনি উক্ত অর্পিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষে তাঁর পীরের নামেই একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

১৯২৫ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারী 'আন্‌জুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া' নামক এই সংস্থা স্থাপিত হলে খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত হরিপুরস্থ রহমানিয়া মাদরাসা পরিচালনা, তাঁর রচিত ৩০ পারা বিশিষ্ট দরূদ শরীফের অদ্বিতীয় কালজয়ী গ্রন্থ 'মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' প্রকাশনা সহ যাবতীয় দায়িত্ব এ সংস্থা কর্তৃক সুচারুরূপে পরিচালিত হতে থাকে। 'আন্‌জুমান-এ শুরায়ে রহমানিয়া'রেঙ্গুন'র চট্টগ্রাম শাখা স্থাপিত হয় ১৯৩৭ সনের ২৯ আগস্ট একই উদ্দেশ্য আঞ্জাম দেয়ার প্রয়োজনে। শুরুতে এ সংস্থা রেঙ্গুনের শাখা হিসেবে কাজ শুরু করলেও ১৯৪২ থেকে চট্টগ্রামের এই সংস্থাই হয়ে ওঠে হুজূর কেবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মিশনের প্রধান অবলম্বন। ১৯৪২-১৯৫৪ পর্যন্ত অন্তত: ১২ বছর পর্যন্ত এই সংস্থার মাধ্যমেই চট্টগ্রাম থেকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হতো হরিপুরের রহমানিয়া মাদরাসার জন্য। সুন্নিয়ত ও তরিক্বতের অন্যান্য কাজও এ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। পঞ্চাশের দশকে এসে বাঁশখালির শেখেরখীলের এক মাহফিলে দরূদ শরীফ বিরোধীদের বেআদবীপূর্ণ আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি চট্টগ্রামে এদের মোকাবেলার জন্য একটি শক্তিশালী মাদরাসা কায়েম করার ঘোষণা দেন। ১৯৫৪ সনের ২২জানুয়ারী এই নয়া মাদরাসা বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হয় 'আন্‌জুমান-এ আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামক অপর এক সংস্থা। সিরিকোটী হুজূরের উপস্থিতিতে এই নয়া আন্‌জুমানের ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ তারিখের এক ঐতিহাসিক সভায় প্রস্তাবিত মাদরাসার নাম রাখা হয় 'মাদরাসা-এ আহমদিয়া সুন্নিয়া' ২৫ জানুয়ারী ১৯৫৬ তারিখের এক সভায় এ মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষে মাদরাসার নামের সাথে "জামেয়া" (বিশ্ববিদ্যালয়) শব্দটি যুক্ত করে এ মাদরাসার নাম রাখা হয় 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া'।

[মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ইতিবৃত্ত ও কর্মসূচি, ২১/১১/২০১২]

চট্টগ্রামের ষোলশহরে স্থাপিত এই মাদরাসা আজ অর্ধশতাব্দিকাল ধরে দেশে সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। ১৮ মার্চ ১৯৫৬ তারিখে ইতিপূর্বে গঠিত আন্‌জুমান দ্বয়ের পরিবর্তে 'আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামক নতুন একক আন্‌জুমান প্রতিষ্ঠা করা হয়। [প্রাগুক্ত]

বর্তমানে এই আন্‌জুমান দেশের প্রধান বেসরকারী দ্বীনী সংস্থা হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত। আন্‌জুমান পরিচালিত এই 'জামেয়া'কে এশিয়ার অন্যতম খ্যাতনামা সুন্নি মারকাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জামেয়ার এতটুকু সফলতার কারণ হলো এই প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহর দরবারে কবূল হয়েছে।

জামেয়া প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেখা যায়-বাঁশখালীর এক মাহফিলে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরূদ-সালামকে ইনকার করার তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে এদের বিরুদ্ধে আদর্শিক মেধাভিত্তিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবেই তৎকালীন 'নয়া মাদরাসা' এই জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জায়গা নির্ধারণ, ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে এর যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়ার

ক্ষেত্রে হযরত সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেন অদৃশ্য কারো ইঙ্গিতের অনুসরণ করছিলেন। তাঁর ঘোষণা অনুসারে "শহর ভি নাহো, গাঁও ভি নাহো, মসজিদ ভি হ্যায়, তালাব ভি হ্যায়" এমন ধরণের জায়গাটি যখন অনেক যাঁচাই-বাছাই শেষে চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ বর্তমানের মাদরাসা এলাকাটি নির্ধারণ করা হয়। তখন এর মাটি থেকে ইলমে দ্বীন'র সুগন্ধি পাওয়া যাচ্ছে বলে উঠেন সুফী মোনাফ খলিফা নামক নাজিরপাড়া নিবাসী সিরিকোটি হুজুরের জনৈক মুরীদ।

এই মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা কে কোত্থেকে করবেন সে সম্পর্কে তিনি অনেক রহস্যময় মন্তব্য করেছিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত এই মাদরাসা পরিচালনার ভার স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন বলে তিনি তাঁর মুরীদদের অভয় দেন। তিনি বলেন-"মেরে কান মে ইয়ে আওয়াজ আতেহে, ইয়ে নয়া মাদরাসা হাম খোদ চালাওঙ্গা" অর্থাৎ এই নতুন মাদরাসা আমি নিজেই চালাবো। সত্যিকার অর্থেই এই মাদরাসা চলছে যেন অদৃশ্য শক্তির ব্যবস্থাপনায়। টাকা-পয়সা যখন যা প্রয়োজন তা ভাবনা-চিন্তা করতে না করতেই চলে আসছে। শুধুমাত্র মাদরাসার টাকা নেয়ার জন্যই আজ আলাদা অফিস খুলে বসতে হয়েছে। কত চেনা-অচেনা লোক এসে হাদিয়া, সদক্বা, মান্নত, নিয়্যতের টাকা, যাকাত-ফিতরা ইত্যাদির টাকা দিয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। মান্নতকারীদের আশাভঙ্গ করেনা এই জামেয়া-তাই, আজ জামেয়া মান্নত পূর্ণ হওয়ার কথা মানুষের মুখে মুখে। শাহ্ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন-"মুঝেহ দেখনা হ্যায় তো, জামেয়া কো দেখো, মুঝসে মুহাব্বত হ্যায় তো, জামেয়া কো মুহাব্বত করো।" ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়তকে বিজয়ী করতে ইশ্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ভিত্তিতে এই মাদরাসা তৈরি করেছিলেন। ফলে, আজ ভেজাল থেকে আসল ইসলামকে রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী 'সাচ্চা আলেম' বের হচ্ছে এই মাদরাসা থেকে।

আল্লামা সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জামেয়ার কারিকুলাম সম্পর্কে বলেন, এই মাদরাসায় প্রয়োজনীয় সকল ভাষাজ্ঞানসহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর উপরও শিক্ষা দিতে হবে। তিনি ভবিষ্যতে ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলাম প্রচারে সক্ষম হয় এমন ইংরেজী ও জ্ঞান বিজ্ঞানে দক্ষ সুন্নী আলেম তৈরির জন্য এই জামেয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জামেয়ার সাচ্চা আলেমরা শুধু মোল্লা না হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় পারদর্শী হয়ে বহির্বিশ্ব পর্যন্ত যেন ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও মূল্যবোধের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন। সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সময় বলেছিলেন, তোমরা ত্রিশ বছর পর্যন্ত হরিপুর রহমানিয়া মাদরাসার খিদমত করেছো। তাই, তোমাদের জন্য এই নয়া মাদরাসা (জামেয়া) উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। যদি এই জামেয়ার দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দাও তবে জেনে রেখো, এরপর তোমাদের জন্য আরো অনেক বড় বড় দায়িত্ব অপেক্ষা করছে। আর এই বড় দায়িত্ব যে 'হুকুমত' তাও তিনি কয়েক দফা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, মনে হচ্ছে, এখনো আমরা এই দায়িত্ব কাঙ্ক্ষিতভাবে পালন করতে পারিনি, তাই আজ হুকুমতও আমাদের হাতে নেই। কারণ, হুকুমতের যোগ্য লোক এখনো আমরা তৈরি করতে সক্ষম হইনি। তাই, আমাদের এই লক্ষে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশে সুন্নিয়তের পূনর্জীবনের কারণে তিনি আজও প্রাতঃস্মরণীয়

সমগ্র বিশ্বে তাঁর দ্বীনি সেবার জ্বলন্ত নিদর্শন ও স্বাক্ষী থাকবার পরও বলতে হয় যে, বাংলাদেশই ছিল তাঁর খেদমতের এই ধারাবাহিকতায় পূর্ণতার ঠিকানা। যে আলোর মশাল নিয়ে তিনি আফ্রিকা থেকে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত এই বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এনে মজবুতভাবে গেঁড়ে দিয়েছেন বলে তাঁর নাতি পীর সাবির শাহ্ (মা.জি.আ) একবার চট্টগ্রাম জামেয়ার ময়দানে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষনে মন্তব্য করেছিলেন। মনে হয়, তিনি বাঙালিদের জন্যই জন্মেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মাই ভি বাঙালি হুঁ। ১৯৫৮ 'র পর যখন আর এ দেশ সফরে আসলেননা, তখন বাঙালি মুসলমানদের প্রতি তাঁর দরদ ভরা আশ্বাস ছিল "জিসিম মেরা সিরিকোট মে, আউর দিল মেরা বাঙ্গাল মে পড়া হুয়া হ্যায়"। তিনি নাকি এমনও বলতেন যে, "বাঙালিওকা সাত মেরা হাশর হোগা"। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের খবর যে হুজুর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এদেশের মানুষকে ভালবাসেন, এবং নিজের করে নিয়েছেন। ১৯৪২ হতে ১৯৫৮ সনের আগ পর্যন্ত, কোন অসুস্থতাই তাঁকে বাংলা মুলুকে সফর করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। একবার

প্রচন্ড জ্বর ও অন্যান্য অসুস্থতার কারণে তিনি যখন চলতে ফিরতে অক্ষম, এমন সময়ে পরিবার থেকে তাঁকে সে বার এ দেশ সফরে না আনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ কথা শুনে বলেছিলেন -''নেহী, মুঝেহ্ প্লেইন মে চড়হা দো, আগর রাস্তা মে মেরি মওত আয়ি তো মেই আল্লাহকা পাছ কেহ্ চোকেঙ্গা কে এয়া আল্লাহ্, তেরে রাস্তা মে মেরে মওত হুয়ি'' সুবহানআল্লাহ! তখন হুজুরের বয়স একশ অতিক্রম করেছিল, এরপরও শারীরিক অপারগতা কখনো তিনি প্রকাশ করেননি, আর এমন ত্যাগের কারণেই তিনি বাংলাদেশের সুন্নিয়তের জাগরণে প্রধান পথিকৃৎ হতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর সফরকাল ছিল জীবনের শেষ ২৩ বছর। প্রথমে রেঙ্গুনে আসা যাওয়ার পথে যাত্রা বিরতিতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য, এভাবে ১৯৩৬-৪১ পর্যন্ত । আর ১৯৪২-১৯৫৮ পর্যন্ত নিয়মিত শীতকালিন সফরে এসে থাকতেন বেশ কয়েক মাস ।এই সময়ে তাঁর হাতে হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়, এবং শরিয়ত-ত্বরিকতের ব্যাপক উন্নতি সহ দ্বীনি শিক্ষা বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানের ফলে তাঁর হাতে সুন্নিয়তের পূনর্জীবন ঘটে, যা আজ সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ মহল অকপটে স্বীকার করেন। আজো তাঁর হাতে গড়া চট্টগ্রামের জামেয়া-আনজুমান বাংলাদেশের সুন্নিদের নির্ভরতার প্রধান ঠিকানা হিসেবে অব্যাহত আছে। আজ তাঁর আন্‌জুমানের হাতে পরিচালিত হয় শতাধিক মাদরাসা। আর, নতুন এক বিপ্লবী সুন্নি ধারার মাদরাসা কায়েমের প্রলয়ংকরী এই যাত্রায় ''মসলকে আ'লা হযরত ভিত্তিক চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (১৯৫৪)'' ছাড়াও, তাঁর হাতে ১৯৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় রাউজান দারুল ইসলাম মাদরাসা, যা বর্তমানে আনজুমান ট্রাস্ট'র হাতে পরিচালিত এবং মাস্টার্স স্তরের কামিল মাদরাসায় উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর হাতে পূনর্জীবন লাভ করেছে আরো বহু প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে হাটহাজারীতে-কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাজিল মাদরাসা অন্যতম। ১৯৫৮ সনে এই কাটিরহাট মাদরাসা হাটহাজারীর বাতিলদের কবল থেকে রক্ষা পায় হযরত সিরিকোটি হুজুরের পদক্ষেপ ও সেখানে তাঁর সরেজমিন শুভাগমনের মাধ্যমে। এমন আরও অনেক মাদরাসা রয়েছে যেসব তাঁর প্রভাবে নতুন জীবন পায়। বিশেষত তাঁর হাতে কাদেরিয়া ত্বরিকায় যেমন নতুন জোয়ার আসে, তেমনি এ দেশবাসী পায় ''মসলকে আলা হযরত'' নামক সুন্নিয়তের বিশুদ্ধতম ধারার সন্ধান লাভ। বিদ্যমান পীর, সিলসিলাহ্ ও দরবারগুলোর জন্যও তিনি ছিলেন এক মহান পথ প্রদর্শক ও সংস্কারক। গাউসে পাক জিলানি (রা) যেভাবে তাঁর বহুমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব দিয়ে দ্বীনের পূনর্জীবন দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে সিরিকোটি হুজুরের হাতে সুন্নিয়ত পায় নতুন জীবন। আজ বাংলাদেশের যেখানেই সুন্নিয়তের আলো দৃশ্যমান, সেখানে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে এর নেতৃত্বে, বা নেপথ্যে রয়েছে শাহানশাহে সিরিকোট, বা তাঁর মাদ্রাসাগুলোর ছাত্রদের অবদান। আর, চট্টগ্রামকে তিনি বানিয়ে গেছেন সুন্নিয়তের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে। কারণ, তাঁর জামেয়া ''সুন্নিয়তের প্রধান ক্যান্টনমেন্ট'' (উক্তি -শহীদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকি ও স্বীকৃতি দেশের সকল মহলের) আজ ঢাকার মুহম্মদপুরে তাঁর আনজুমানের অপর কামিল-মাস্টার্স মানের সুন্নি মাদরাসা হল মুহম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসা। যা রাজধানীর বুকে সুন্নিদের প্রধান অবলম্বন এবং বাংলাদেশের সুন্নিয়ত রক্ষার দ্বিতীয় ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত হয়। বর্তমানে ঢাকার বুকে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ইনশাল্লাহ্, কারণ এখানে ১৯৫২ সনে শাহানশাহ্ এ সিরিকোটের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় কায়েৎটুলিস্থ খানকাহ্ শরিফ।

আরব দেশে তাঁর সফরের কারণে

মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, বাগদাদ শরিফ বিভিন্ন সময়ে সফর করেছিলেন সিরিকোটি হুজুর। এ সব সফরের সময় তাঁর হাতে স্থানীয় এবং ভিন্ন দেশ হতে সফরকারী বহু লোক বায়াত গ্রহন করে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে, ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের হজ্বের সময়ের একটি ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। আর, ঘটনাটি হল, এই বছর সিরিকোটি হুজুর মদিনা শরিফে অবস্থানকালে সে সময়ে মদিনা পাকের রওজা শরিফের খাদেম সৈয়্যদ মনজুর আহমদের মত একজন অতিব সন্মানিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সিরিকোটি হুজুরের কাছে এসে, তাঁকে বায়াত করিয়ে নেবার আবেদন জানান। হুজুর কেবলা বলেন, ''বর্তমান দুনিয়ায় আপনার চেয়ে এমন সম্মানিত হাস্তি আর কে হতে পারেন, যিনি খোদ রওজায়ে আক্বদাস শরিফের খেদমতে আছেন? সুতরাং আপনি কেন আমি অধমের হাতে বায়াত হবেন?''। তখনি উক্ত সন্মানিত খাদেম সাহেব জানালেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং স্বয়ং রাসুলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পেয়েই হযরত সিরিকোটি হুজুরের হাতে বায়াত গ্রহণের জন্য আসতে বাধ্য হয়েছেন। আর, সিরিকোটি হুজুরও তাঁকে শেষতক বায়াত করিয়ে নিজের মুরিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সে থেকে উক্ত মহামান্য খাদেম সাহেব হুজুরের অনুসরণে চলতেন, এবং দ্বীনের সেবায় যোগ দেন। এ বছর, ১৯৪৫ সনের হজ্জের সময়েই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড ওয়াবেল ব্রিটেনের পথে জেদ্দা বিমান বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এ সময়ে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের এক উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, আন্দোলনরত ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি কখনো বাস্তবায়িত হবেনা। আর, এ খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হবার পর সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা হতাশাগ্রস্থ হয় এবং ভারতীয় মুসলমানরা একদম ভেঙ্গে পড়েন। তাঁরা রওজা মোবারকে এ জন্য আরজি পেশ করবার জন্য হজ্বব্রত পালনরতদের মাধ্যমে উক্ত মহামান্য খাদেম হযরত সৈয়্যদ মনজুর আহমদ সাহেবের স্মরণাপন্ন হলেন। কিন্তু খাদেমজি নিজে সরাসরি রওজা পাকে ফরিয়াদ না করে চলে আসেন সিরিকোটি হুজুরের কাছে, এবং বিষয়টি হুজুরের কাছে পেশ করে বলেন, "হুজুর আপনি আমার পীর -মুর্শিদ, সুতরাং এখন আপনি এখানে অবস্থানকালে আমি সরাসরি এ ফরিয়াদ করতে পারিনা, তাই মেহেরবানি করে আপনি আসুন, এবং ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার ফরিয়াদটি আপনি নিজেই দয়াল নবী পাক (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কদম পাকে পেশ করুন। হুজুর, খাদেম সাহেবের কাছে ওয়াবেলের কথা শুনে খুব ক্ষেপে যান এবং "এটা অসম্ভব" বলে মন্তব্য করেন। সাথে সাথে খাদেমকে সাথে নিয়ে রওজা শরিফের ভিতরের বিশেষ জায়গায় প্রবেশ করলেন, আর বের হয়ে, অত্যন্ত জালালি হালতে বললেন, "ওয়াবেলকা বাত ঝুটা হ্যায়, (মুসলমানুকা) পাকিস্তান করিব আ যায়েগা"। আলহামদুলিল্লাহ্, এর দুই বছর পরই, ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট, পাকিস্তানের জন্ম হল, এবং ভারত থেকে স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ পেল মুসলমানরা। এই প্রসঙ্গে, সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯৫২ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত "জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান"র এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, তাঁর মহান পীর খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে ২৭ বছর আগে (১৯২০ খ্রি) বলে দিয়েছিলেন, "ইংরেজ চলা যায়েঙ্গে, আউর মুসলমানুকা কাম দাড়িমুন্ডা সে সাম্বালেঙ্গে"। [খোতবায়ে ছদারাত, প্রকাশনায়, করাচি, পাকিস্তান]

যা, সাতাশ বছর পর, ১৯৪৭ সনে বাস্তবায়িত হয় পাকিস্তানের জন্ম দাড়ি বিহীন নেতা ড. ইকবাল, জিন্নাহ্, লিয়াকত আলি খা, শেরে বাংলা ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী'দের নেতৃত্বে আলোর মুখ দেখার মধ্য দিয়ে। যা হোক, সিরিকোটি হুজুরের কোন সফরই দ্বীনের সেবার বাইরে ছিলনা। বাগদাদ শরিফ সহ আরো যে সব দেশে তাঁর ভ্রমন হয়েছে সেখানেও হয়ত পাওয়া যাবে তাঁর খেদমতের নিদর্শন, যা গবেষকদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বেরিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ্।

অন্যান্য দেশে তাঁর প্রভাব

সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি যখন রেংগুনে আসা যাওয়ার পথে কলিকাতা যাত্রা বিরতি করতেন কয়েকদিন। এই সময়ে তিনি ধরমতলা ওয়াসেল মোল্লার সাত তলা ভবনে থাকতেন। এখানে তাঁর বিশিষ্ট মুরিদ এবং পরবর্তিতে খেলাফত প্রাপ্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার মুজাফ্ফরুল ইসলামের বাসভবনে তিনি উঠতেন। নোয়াখালি নিবাসি এই ডাক্তার হুজুরের খুব আপনজন ছিলেন। ডাক্তার ছিলেন ১৯২০ সালের এম বি পাশ ডাক্তার। তিনিও রেঙ্গুনে সিরিকোটি হুজুরের হাতে বায়াত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২১ জিলক্বদ, হুজুর কেবলা সিরিকোটি যখন রেঙ্গুন হতে দীর্ঘ ১৬ বছর পর স্বদেশে যাচ্ছিলেন সেবার পথিমধ্যে দু'দিন কলিকাতা থাকবার কথা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়। [ইফতিতাহিয়্যা, ড. প্রফেসর মাসউদ আহমদ]

উল্লেখ্য, রেঙ্গুন-কলিকাতা-করাচি রুটেই ছিল হুজুরের স্বদেশে আসা যাওয়া। ১৯৩৬ সন থেকে, এই পথে আসা যাওয়ার কোন এক সময়ে তিনি চট্টগ্রামেও যাত্রা বিরতি করতেন। চট্টগ্রামের এই মাত্র কয়েকদিনের অবস্থান পরবর্তিতে এখানকার মানুষের ভাগ্যকে প্রসন্ন করে দিয়েছিল, এবং ১৯৪২ হতে রেঙ্গুনের ২১/২২ বছরের মিশন চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়েছিল। যেহেতু, তিনি কলিকাতায়ও কিছুদিন থাকতেন তাই আশা করা যায় যে, সেখানেও তাঁর কিছু না কিছু অবদান থাকতে পারে, যা হয়ত ঠিকমত অনুসন্ধান করা হলে বের হয়ে আসবে। তবে, হুজুরের কলিকাতা সফরের বেশকিছু কারামতের কথা জানা যায়। এর একটি হল: একবার ডাক্তার মুজাফ্ফরুল ইসলামের বিবি আবেদা খাতুন কি এক কারণে হুজুরের কাছে আসবার সুযোগ পান, এবং এই সময় হঠাৎ আবেদার চোখ বেয়ে

পানি এসে তা গড়িয়ে পড়তে থাকে। বিষয়টি হুজুরের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন যে কেন আবেদা কাঁদছেন, ডাক্তার (স্বামী) কিছু বলেছে? তিনি বলতে চাচ্ছিলেননা, কিন্তু হুজুর বারবার জানতে চাপ দিচ্ছিলেন, তাই বাধ্য হয়ে, বললেন হুজুর! ডাক্তার আরো একটা বিয়ে করবে বলেছে, কারণ, আমি কোন সন্তান দিতে পারিনাই। আজ আমাদের বিয়ে হয়েছে ১৬-১৭ বছর হল, কিন্তু কোন সন্তান সন্ততি নাই, তাই ডাক্তার দ্বিতীয় বিয়ে করবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। আবেদার কান্না দেখে হুজুর খুব ব্যথিত হলেন, বললেন, 'ডাক্তারের এত সাহস, আমার মেয়েকে ঘরে রেখে আবার বিয়ে করবে? ঠিক আছে, আজ আমি ডাক্তারের সাথে এর একটা দফা রফা করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। হুজুর কেবলা আবেদাকে মেয়ে হিসেবে শুধু ডাকেননি বরং ডাক্তার মুজাফ্ফর বাসায় আসার পর তাঁকে এক চোট নিয়ে ছাড়লেন এবং পরিষ্কার করে বলে দিলেন- 'যতদিন আমার মেয়ে আবেদা বেঁচে আছে ততদিন তোমার অন্য মেয়ে বিয়ে করা যাবেনা।' এরপর, আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন সন্তানের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ্, ঘটনাটা সম্ভবত ১৯৪২ এর দিকে হবে, আর ডাক্তারের ঘরে আবেদার সৌভাগ্যের নিদর্শন হয়ে পর পর দুই ছেলের জন্ম হল। প্রথম ছেলে শামসুল ইসলামের জন্ম হল ১৯৪৩ সনে, আর দ্বিতীয় ছেলে কামরুল ইসলামের জন্ম হল ১৯৪৫ সনে, সুবহানআল্লাহ। শামসুল ইসলাম এখন আর দুনিয়াতে নাই। মাত্র কয়েকবছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জামেয়া -আনজুমানের সেবা করে গেছেন। আর, এখনো বেঁচে আছেন কামরুল ইসলাম, তিনি থাকেন চট্টগ্রামে। দুই ভাইয়ের কাছেই তাঁদের জন্মের প্রেক্ষাপট ও সিরিকোটি হুজুরের কারামতের প্রসঙ্গটি শুনেছি এবং লিখে রেখেছিলাম। যদিও এখানে কারামত বলাটা আমার উদ্দেশ্য নয়, ধারনা করা যায় যে, হুজুরের পদচারণা যেখানেই হয়েছে সেখানে দ্বীনের কোন না কোন সেবাও হয়েছে, যদিও এই মুহূর্তে সে তথ্যাদি আমার হাতে নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিরিকোটি হুজুর শুধু কলিকাতা নয়, ভারতের বোম্বে সহ অন্যান্য কিছু জায়গায় ইসলামের খেদমত করেছেন বলে দৈনিক আজাদী'র কলামিস্ট শাখাওয়াত হোসেন মজনু'র একটি বক্তব্যে পাওয়া যায়। আর, হুজুরের আজমির শরিফ সফরের বিষয়টিত আছেই। একবার তাঁর আজমির সফরে শিশু শাহজাদা হাফেজ আল্লামা সৈয়্যদ মুহম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি সাথে ছিলেন এবং সে সফরে একজন আগন্তুক বেশে স্বয়ং খাজা গরীবনওয়াজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি শিশু তৈয়্যব শাহ্ কে সাক্ষাত দেন, আলিঙ্গন করেন এবং হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপের সাথে কিছু দোয়া-কালাম শিক্ষা দেন বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত জানাতে চাই যে, এ আজমির শরিফের বহু খাদেম পরিবার হুজুর তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মুরীদ ছিলেন। ১৩-১৬ আগস্ট ২০১৭, আজমির সফরে, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ সহ অধম সেই পুরোনো নিদর্শনসমূহের একটি 'কামাল মঞ্জিল' এ গিয়েছিলাম। এ মঞ্জিলের বর্তমান গদীনশীন সৈয়দ সামির উদ্দিন চিশতি সে প্রসঙ্গ স্বীকার করে বলেন যে, তাঁর বাবা আলাউদ্দিন চিশতি সহ তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের অনেকেই হুজুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্'র মুরীদ এবং হুজুর কেবলা তাঁদেরকে সে সময় আজমির শরিফে মাদরাসা তৈরীর বিষয়ে নির্দেশ দেন এবং এ বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। সুতরাং বলা যায় যে, দ্বীনের খেদমতের এই ধারাবাহিকতা সিরিকোটি হুজুরের সময় হতেই চলে এসেছিল আজমিরে।সেদিনের সাক্ষাতে এক পর্যায়ে সামির চিশতি সাহেব আমাদেরকে বলেছিলেন যে, যদি এখন গাউসিয়া কমিটি-আনজুমান আজমিরে কোন মাদরাসা বানাতে চায়, তাহলে তাঁরা জায়গা দিতে প্রস্তুত আছেন।

মসলকে আ'লা হযরতের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত

হযরত শাহানশাহে সিরিকোট ছিলেন বাংলাদেশ'র 'মসলকে আ'লা হযরত'র বুনিয়াদ স্থাপনকারী, এমনকি পাকিস্তানের হরিপুর দারুল উলুমকেও তিনি সুন্নিয়তের এই বিশুদ্ধ ধারায় নিয়ে এসেছিলেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, সিরিকোটি হুজুরের ঐতিহাসিক অবদান হল চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার যাত্রা। এর ভিত্তি প্রস্তর রাখবার সময়ই তিনি বলেন- ''ইয়ে নয়া মাদরাসা কা বুনিয়াদ মসলকে আ'লা হযরত পর ঢালা গেয়া হ্যায়''। ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৬, তারিখে এই মাদরাসার একাডেমিক যাত্রা শুরুর সময় এর নামের সাথে 'জামেয়া' শব্দ সংযুক্তি হয় একে মসলকে আ'লা হযরতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই, এ চিন্তাধারার যোগ্য আলেম আল্লামা ওয়াকার উদ্দিন বেরেলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে নিয়োগ দেওয়া হয় এর প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে। পরবর্তিতে একই মসলকের বিশেষজ্ঞ আলেম আল্লামা নসরুল্লাহ্ খাঁন রহমাতুল্লাহি আলায়হি কেও একই দায়িত্বে এনেছিলেন গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁরা স্থানীয় ওলামাদের নিয়ে এদেশে আ'লা হযরতের চিন্তাধারার আলেম ও জনগন তৈরীতে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা আজ অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়,

স্বদেশের হরিপুর সহ তাঁর সমস্ত আবাদি এলাকাতেই আজ মসলকে আলা হযরত যথেস্ট প্রভাবশালী একটি সুন্নি সহীহ্ ধারা হিসেবে পরিচিত। 'শরহুল হুকুক' সহ আ'লা হযরত রচিত বহু কিতাবের অনুবাদ করে স্থানীয়দের মধ্যে বিতরনের ব্যবস্থা হয়ে আসছে তাঁর হাতে পরিচালিত দারুল উলুম রহমানিয়া সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে, যা মূলত তাঁরই প্রেরণার ফসল বিধায়, উক্ত কিতাবের উর্দু তরজমাকারী আল্লামা আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মত বিখ্যাত আলেম, উক্ত কিতাবের তরজমার মুখবন্ধে সিরিকোটি হুজুরের বিশাল দ্বীনি খেদমতের কথা অকপটে লিখে গেছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আ'লা হযরত গবেষক প্রফেসর ড: মাসউদ আহমদ, মিশরের আল আজহারের প্রথম আ'লা হযরত বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভকারী মৌলানা মমতাজ আহমদ ছদীদি, পাকিস্তানের বিখ্যাত মুফতি আবদুল কাইউম হাজারভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, মাওলানা সৈয়্যদ আমির শাহ্ গীলানী পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা গবেষক-আলেমের কলমে হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র অবদানের বিষয়টি উঠে এসেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আজ, এ দেশে, এমনকি মিশরের আল আজহার, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই চিন্ত ধারার উচ্চতর গবেষণায় সিরিকোটি হুজুরের জামেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। আ'লা হযরত কৃত কোরানের বিশুদ্ধতম তরজমা কানজুল ঈমান সহ আজ বহু জরুরি কিতাবের অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনায় যিনি বাঙালি সুন্নি মুসলমানদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র, সেই জান্নাতি মানুষ মৌলানা আবদুল মান্নান সহ আজ এ মসলকের অধিকাংশ দায়িত্ব পালনকারীই জামেয়ার, বা ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়ার ছাত্র, যা দিনের সূর্যের মতই স্পষ্ট। উল্লেখ্য, আল্লামা সিরিকোটি (জন্ম ১৮৫৬-৫৭ খ্রি, ওফাত ১৯৬১ খ্রি) এবং আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলবী (জন্ম ১৮৫৬, ওফাত ১৯২১ খ্রি) সমসাময়িক বটে, কিন্তু সিরিকোটি হুজুর বেঁচে থাকেন আরো চল্লিশ বছর বেশি। তাঁর এমন লম্বা হায়াতের ১৯৫৮ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দেশে নিরলস দ্বীনি সেবার সুযোগ নেন, যেখানে মসলকে আ'লা হযরত পরিচিতিও ছিল এবং পরের সময়টাতে কাটান স্বদেশের দ্বীনি সেবায়। তাঁর শতাধিক বছরের হায়াতটাই ছিল হায়াতে তাইয়্যেবা। যেখানে ছিলনা কোন বিশ্রাম, ছিলনা কোন অবসর।

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার নতুন জীবন দান

ড: মুহম্মদ এনামুল হক, রচনাবলীর ১১৭ পৃষ্ঠায়, 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' অংশে কাদেরিয়া ত্বরিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় যে, পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে বাগদাদ হতে হযরত সৈয়্যদ শাহ্ কামিস এসে ইসলাম প্রচার করেন, বাংলায় তাঁর বহু ভক্ত ও খলিফা ছিলেন। তিনি ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ওফাত বরণ করেন। এরপর, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন শাহ্ সৈয়্যদ আবদুর রাজ্জাক নামক তাঁর খলিফা। এরপর, বাংলায় কাদেরিয়া ত্বরিকার মূলধারার অন্য কোন প্রতিনিধিত্বের তথ্য জানা যায়না

[মোহাম্মদ আবু তালেব, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের অবদান ১৯০০-২০০০, শীর্ষক গবেষণা পত্র]

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে, আমরা ধরে নিতে পারি যে, ১৫৮৪'র শাহ্ কামিস (রহ.)'র পর খলিফা শাহ্ আবদুর রাজ্জাক রহমাতুল্লাহি আলায়হি যদি আরও একশ বছরও বেঁচে থাকেন, তবুও বলতে পারি যে, কাদেরিয়া ত্বরিকার মূলধারা, বা এর কোন বড় ধরনের প্রভাব দীর্ঘ আড়াইশ বছর (১৬৮৫--১৯৩৫) দৃশ্যমান হয়নি। আর, এ বিশ্বশ্রেষ্ঠ কাদেরিয়া ত্বরিকার মূলধারা আজ বাংলাদেশে বলা যায় প্রধান সূফি ধারা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে- যা শাহানশাহে সিরিকোট 'র এক ঐতিহাসিক অবদান।

উল্লেখ্য, সিরিকোটি হুজুর রেঙ্গুন হতে কাদেরিয়া ত্বরিকার মশাল হাতে চট্টগ্রামে আসা -যাওয়া শুরু করেন ১৯৩৫-১৯৩৬ সনের দিকে। [সাজরা শরিফ]

আর, ১৯৪২ হতে, পুরোদমে শুরু হয় তাঁর বাংলাদেশ মিশন, যা ১৯৫৮ পর্যন্ত তাঁর প্রত্যক্ষ সফরের মাধ্যমে, এবং পরবর্তিতে তাঁর শাহ্জাদা, মাতৃগর্ভের অলী হিসেবে খ্যাত, গাউসে জামান, আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ হুজুর (১৯৬১-১৯৮৬) এবং তাঁর বড় নাতি রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরিকত, আল্লামা তাহের শাহ্ (১৯৮৬-বর্তমান)'র হাতে ধারাবাহিক উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সিলসিলার মুরিদ-ভক্ত এবং অনুসারি সংখ্যা কল্পনাতীত, যারা আজ মাঠে-ময়দানে, শরিয়ত-ত্বরিকত, তথা সুন্নিয়তের জাগরণে প্রধান ধারার কর্মি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত, আলহামদুলিল্লাহ্। বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কার জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) এ সিলসিলারই পরবর্তী সাজ্জাদানশীন গাউসে জামান

আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহ.)'র দান। বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.)'র হাতে এ জশনে জুলুস বর্তমানে ৪০ লাখ মানুষের গণজোয়ারে রূপ নিয়েছে। যা সুন্নিয়ত ও কাদেরিয়া তরিকার বর্তমান জাগরণকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গাউসুল আযম জিলানি (রা)'র শ্রেষ্ঠ কাদেরিয়া ত্বরিকা তাঁর বিভিন্ন খলিফা, এবং বংশীয় সাজ্জাদানশীনদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি বিকশিত হয়। বড়পীরের সবচেয়ে প্রিয় শাহজাদা ছিলেন শাহ্ আবদুর রাজ্জাক, যিনি বাগদাদে একজন শীর্ষ আলেমে দ্বীন হিসেবে খ্যাত ছিলেন। সেই শাহ্জাদা আবদুর রাজ্জাক, এবং বাগদাদের প্রধান বিচারপতি বড়পীরের নাতি খাজা আবু সালেহ নসর (রা)'র মাধ্যমে যে ধারা প্রবাহিত হয়, তাই মূল বা প্রধান ধারা, এমনকি শ্রেষ্ঠ ধারা বলা যায়। আর এই কাদেরিয়া সিলসিলাহর এই মূল ধারায় কয়েক শতাব্দির শ্রেষ্ঠ কামেল সাজ্জাদানশীন ছিলেন খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি যাকে খলিফায়ে শাহে জীলান লক্বে অভিহিত করা হয়। সেই গাওসে দাঁওরা, খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'রই সাজ্জাদানশীন প্রধান খলিফা হবার সৌভাগ্য লাভ হয় হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র। শুধু তাই নয়, হযরত খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, সিরিকোটি হুজুরকে এ বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন যে, অলি আল্লাহদের প্রধান আধ্যাত্মিক আসন 'গাউসে জামান' পদটি কাদেরিয়া ত্বরিকায় থাকবে, যদি এর দায়িত্ব আওলাদে রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থাকেন। আর, এই রহস্যময় উক্তিটি ছিল হুজুর সিরিকোটি এবং তাঁর অব্যাবহিত কয়েকজন আওলাদে পাকের হাতে এ মোবারক দায়িত্ব থাকবার সুসংবাদ। আর, শত বছর আগেকার এ উক্তির তাৎপর্য এখন দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। আজ কাদেরিয়া সিলসিলাহর সিরিকোটিয়া ধারার হাতেই দ্বীনের নেতৃত্ব অব্যাহত আছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তাই সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ অঞ্চলে একাধারে কাদেরিয়া ত্বরিকার মূলধারার এবং ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়তের নতুন জীবনদাতা মহান সংস্কারক অলি আল্লাহ্।

লেখক: যুগ্ম মহাসচিব-গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদ।

ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন

শাহানশাহে সিরিকোট হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি

[রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি যুগ ও শতাব্দিতে সৃষ্টির সেরা মানবজাতি যখন পথহারা হয়ে নানাবিধ গোমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতার শিকার হয়ে সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে, তখন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে মহান হাদী বা সঠিক পথের দিশারীদের প্রেরণ কিংবা সৃষ্টি করে মানুষকে সঠিক ও কৃতকার্যতার পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এ পথ প্রদর্শকদের শীর্ষে রয়েছেন সম্মানিত নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম। এ নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর শুভাগমনের ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করে নবী ও রসূলকুল শ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীপৃষ্ঠে শুভাগমনের মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রসূল। তাঁরপর আর কোন নবী ও রসূল পৃথিবী পৃষ্ঠে আসেননি, আসবেনও না। ক্বিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম নবী হিসেবে আসবেন না, তিনি আসবেন শেষ যামানার নবীর উম্মত ও তাঁর দ্বীনের প্রচারক ও খিদমতগার হিসেবে। আর এ শেষ যামানার নবীর প্রতিষ্ঠিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ দ্বীন-ইসলামকে সেটা আসল রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব বর্তানো হয় এ উম্মতের হাক্কানী রব্বানী ওলামা-ই কেরামের উপর। এ হক্বক্বানী-রব্বানী ওলামা-ই কেরামের এক বিশেষ শ্রেণী হলেন আল্লাহর ওলীগণ।

আরো লক্ষণীয় যে, সম্মানিত নবী-রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম নিজ নিজ যুগে ছড়িয়ে পড়া সব বাতিল বা মিথ্যা এবং পথভ্রষ্টতাকে চিহ্নিত করে সেগুলোর বিরুদ্ধে সফল মোকাবেলা করে সেগুলোর স্থলে হিদায়তের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সত্যকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা তা করতে পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। নবী ও রসূলগণের ধারা পরিপূর্ণ ও শেষ হবার পর তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন ও করে যাচ্ছেন তাঁদেরই ওয়ারিসরূপে ইসলামের হক্বক্বানী-রব্বানী ওলামা-মাশাইখ। এর ফলশ্রুতিতে আজ পর্যন্ত ক্বোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা' ও ক্বিয়াস ভিত্তিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলামের সঠিক রূপরেখা সুন্নী মতাদর্শ বিশ্বমাঝে অম্লান অবয়বে ও স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

একথাও সুস্পষ্ট যে, বিশ্ব থেকে বাতিলকে অপসারণ কিংবা চিহ্নিত করার জন্য এবং তদস্থলে সত্যকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবী-রসূল, বিশেষত: আমাদের আক্বা, নবী ও রসূলকুল শ্রেষ্ঠ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে সর্বদিক দিয়ে অসাধারণ জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি তাঁর প্রবর্তিত দ্বীন ও আদর্শকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও রাখার জন্য তাঁর উত্তরসূরী ওলামা-মাশাইখকেও তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা এবং বিশেষ সাহায্য প্রদান করেছেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের ন্যায় আমাদের এ উপমহাদেশে এবং আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে বহুবিধ বাতিলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে এ উপমহাদেশে যেসব প্রকৃত নায়েবে রসূল, দূরদর্শী এবং দ্বীন ও মাযহাবের অকৃত্রিম দরদী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার মহান শায়খ ওলী-ই কামিল হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী, সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী আলায়হির রাহমাহ্ হলেন অন্যতম। তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞান, বেলায়তের ক্ষমতা, অব্যর্থ দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে একদিকে সমসাময়িক সব বাতিলকে চিহ্নিত করে সেগুলোর সাথে সফল মোকাবেলা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও কোথাও একই ধরনের কিংবা নতুন নতুন পথভ্রষ্টতা দেখা দিলে সেগুলোর বিরুদ্ধে অব্যর্থ মোকাবেলার স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে এ উপমহাদেশে সিলসিলাহ্-এ আলিয়া ক্বাদেরিয়ার শিক্ষা ও রূহানী দীক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি ও সব

বিপদাপদে খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্তির সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা করে গেছেন। এ নিবন্ধে তাঁর গৃহীত সফল ও বরকতময় পদক্ষেপগুলোর সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

এটাও বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর নুবূয়তী শক্তির সামনে যেকোন কুফরী ও তাগূতী শক্তি হার মানতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে তাঁদের পথ প্রদর্শন ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগণিত সৌভাগ্যবান মানুষ সত্যের পথে এসেছে, দ্বীন-ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য অর্জন করে ধন্য হয়েছে। সুতরাং আমাদের আক্বা ও মাওলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী যিন্দেগীর প্রতিটি বিষয়ে এবং কথা, কাজ ও অনুমোদনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য সফলতাই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরই আনুগত্য ও অনুসরণে অগণিত আউলিয়া-ই কেরাম একইভাবে এক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছেন।

এখন ক্বাদেরিয়া তরীক্বার মহান বুযুর্গ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি আলায়হির রাহমাহ্র বেলায়তী শক্তি, দুরদর্শিতা ও অবদানগুলোর কথা আলোচনা করা যাক! তিনি একাধারে একজন সৈয়দ বংশীয় যুগশ্রেষ্ঠ সুন্নী আলিম-ই দ্বীন, মুর্শিদে কামিল, অকৃত্রিম খোদাপ্রেমিক ও আশেক্ব-ই রসূল, গণ-মানুষকে জান্নাতের পথে আনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আন্তরিক, সর্বোপরি একজন অসংখ্য কারামতসম্পন্ন ওলী-ই কামিল ছিলেন। এ কারণেই তিনি সমসাময়িক যাবতীয় বাতিলের সাথে সফল মোকাবেলা করে ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়ভাবে সফল হয়েছিলেন।

শাহানশাহে সিরিকোটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তিনি ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ৩৭তম অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর আসল নাম 'আহমদ'। তাঁর নামের আগে 'সৈয়্যদ' শব্দটি বংশীয় উপাধি আর 'শাহ্' শব্দটি জাতিগত উপাধি হিসেবে সংযোজিত হয়। তাই তিনি সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি' নামে সমধিক খ্যাত। 'সিরিকোট' তাঁর জন্ম ও বাসস্থান। তিনি খাঁটি সাইয়্যেদ বংশের এক প্রসিদ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ সদর শাহ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। অধিকাংশের মতে তিনি ১৮৫৭ ইংরেজি সালে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিরিকোট গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। তিনি অল্প বয়সে পবিত্র ক্বোরআন হিফয করেন। স্থানীয় বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য হিন্দুস্থানে গমন করেন। ১২৯৭হি. মোতাবেক ১৮৮০খ্রিস্টাব্দে উচ্চতর ডিগ্রীর সর্বশেষ সনদ অর্জন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দির নব্বইর দশকে বিবাহ্ করেন। অতঃপর ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে সূতা ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে চলে আসেন। দেশে এসে ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার মহান পীর, মা'আরিফে লাদুনিয়ার প্রসবণ ও উলুমে ইলাহিয়ার ধারক হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী আলায়হির রাহমাহর বরকতময় হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৯২০ ইংরেজি সালে আপন পীরের নির্দেশে প্রায় ৬৩ বছর বয়সে বার্মায় গমন করেন এবং ত্বরীক্বা-ই ক্বাদেরিয়া সম্প্রসারণের প্রয়াস পান। পরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ ত্বরীকার প্রচার-প্রসারে বহুমুখী অবদান রাখতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৯৬১ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন।

বেলায়তের উচ্চাসন লাভ

বেলায়ত লাভের তিন পদ্ধতিঃ ১. মাতৃগর্ভ থেকে ওলী হয়ে জন্মগ্রহণ করা, ২. আল্লাহর কোন নেক বান্দার কৃপাদৃষ্টিতে বেলায়তপ্রাপ্ত হওয়া এবং ৩. রিয়াযত-মুজাহাদার মাধ্যমে বেলায়তের মর্যাদায় উপনীত হওয়া। সুতরাং প্রথমত, শাহানশাহে সিরিকোট বংশীয়ভাবে খাঁটি সাইয়্যেদ। দ্বিতীয়ত, তাঁর পীর-মুর্শিদ হলেন হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তৃতীয়ত, রিয়াযত-মুজাহাদায়ও তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি আপন মুর্শিদ কামিলের লঙ্গরখানা ও মাদরাসার হোস্টেলের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন খিদমতটি আনজাম দিয়েছিলেন দীর্ঘ দিন যাবৎ। তিনি নিজ বাড়ী সিরিকোটের পাহাড় হতে সারাদিন লাকড়ি সংগ্রহ করতেন, দিন শেষে তা আঠার মাইল দূরে অবস্থিত চৌহার শরীফে নিয়ে যেতেন। এর ফলে তাঁর হাতে ও ঘাড়ে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিলো, তার চিকিৎসা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত চলেছিলো। আর এই ক্ষত সম্পর্কে তিনি বলতেন, "ইয়ে মেরে বাবাজী কা মোহর হ্যায়।' তারপর তিনি লোকালয় ছেড়ে বন-জঙ্গলে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগূল হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু অনুমতি চাইতে গেলে তাঁর মুর্শিদ হযরত চৌহরভী বলেছিলেন, "বন-জঙ্গলে কঠিন মুজাহাদার চেয়ে উত্তম ও সুন্নাত হলো মানুষের মধ্যে থেকে দ্বীনের খিদমত করা।"

তারপর তিনি লাহোর শাহী জামে মসজিদের ইমামতি করার অনুমতি চাইলে হযরত চৌহরভী সেটারও অনুমতি দিলেন না। কারণ তাতে এক গূঢ় রহস্য নিহিত ছিলো। এরপর তিনি তাঁর মুর্শিদের নির্দেশে আরেক কঠিন রেয়াযতে ব্রতী হন। তা হচ্ছে স্বদেশ ছেড়ে সুদূর রেঙ্গুনে গিয়ে দ্বীনের খিদমত আনজাম দেওয়া।

শাহানশাহে সিরিকোটের মুর্শিদ হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী ছিলেন 'গাউসুল আ'যম শাহানশাহে জীলানীর সিলসিলার এক মহান ওলী। তিনি তাঁর রূহানী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরতুল আল্লামা সিরিকোটির মাধ্যমে রেঙ্গুন ও চট্টগ্রামে এক যুগান্তকারী দ্বীনী খিদমত নেবেন। সুতরাং তিনি হযরত সিরিকোটি আলায়হির রাহমাহকে রেঙ্গুন চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি বিগত ১৯২০ ইংরেজি সালে স্বদেশের মায়া ছেড়ে রেঙ্গুনে চলে যান। এভাবে তিনি বেলায়তের এক অতি উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হন।

দ্বীন ও মাযহাবের বড় বড় খিদমত

এ ক্ষেত্রে শাহানশাহে সিরিকোটের মধ্যে বড় বড় দ্বীনী সংস্কারক, ইসলাম ও সুন্নিয়াতের মহান প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাকারীর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যেই আদর্শ ও বেলায়তী ক্ষমতা বলে হযরত শাহানশাহে বাগদাদ সারা বিশ্বে ইসলামকে পুনর্জীবিত করেছেন, খাজা গরীব নাওয়ায ভারতে বোত-প্রতিমা ও অগ্নিপূজা ইত্যাদির স্থলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, হযরত শাহ জালাল ইয়ামনী সিলেটী আলায়হির রাহমাহ বাংলাদেশের এক বিশাল অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে হযরত শাহানশাহে সিরিকোট বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের অনন্য খিদমত আনজাম দিয়েছেন। তাঁদের কাউকে এসব অবদান রাখার জন্য কোন রাজকীয় ক্ষমতা, বিশাল বিশাল জনবল, শক্তিশালী অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার করতে হয়নি; বরং তাঁদের আদর্শ চরিত্র, অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও সময়োচিত বাস্তব পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি অদম্য বেলায়তী ক্ষমতা দেখে অগণিত অসংখ্য মানুষ অনায়সে ইসলাম ও সুন্নিয়তকে গ্রহণ করেছিলো। এ সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে অকাট্য গ্রন্থ-পুস্তক এবং ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

এ নিবন্ধে শাহানশাহে সিরিকোটের কতিপয় ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

এক. দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন, মোম্বাসা ও জাঞ্জিবারের বিভিন্ন জনপদে শাহানমাহে সিরিকোটের হাতে অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

[সূত্র. ড. ইব্রাহীম এম. মাহদী লিখিত এ্যা শর্ট হিস্ট্রী অব ইসলাম ইন সাউথ আফ্রিকা]

দুই. ১৯১১ইংরেজি সালে তাঁর নিজের অর্জিত অর্থে আফ্রিকার প্রথম জামে মসজিদটি তাঁর হাতেই নির্মিত হয়। [সূত্র. প্রাগুক্ত]

তিন. ১৯০২ ইংরেজি সনে হরিপুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম ইসলামিয়া রহমানিয়া' হযরত সিরিকোটি আলায়হির রাহমাহর বরকতময় হাতেই বিশাল মারকায (কেন্দ্র) হিসেবে পূর্ণতা পেয়েছে।

চার. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রেঙ্গুনে শুভ পদার্পন করেন। এখানে তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ ২১-২২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি তৎকালীন বার্মায় হাজার হাজার অমুসলিমকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং অসংখ্য বিপথগামী মুসলমানকে বানিয়েছেন সাচ্ছা (সুন্নী) আক্বীদার পরহেযগার বান্দা।

[সূত্র. সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, আঞ্জুমানে শূরা-ই রহমানিয়া, রেঙ্গুন, ৬ অক্টোবর, ১৯৩৫ইং]

পাঁচ. তিনি রেঙ্গুন গমন করে প্রথমে ক্যাম্পবেলপুরে মাওলানা সুলতানের মাদরাসায় এবং পরবর্তীতে রেঙ্গুনের বিখ্যাত বাঙালী সুন্নী জামে মসজিদের খতীব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তা'লীম তারবিয়াত এবং হিদায়তের ফলে অনেক সৌভাগ্যবান বান্দা ইনসান-ই কামিল, এমনকি ওলী-বুযুর্গে পরিণত হন।

ছয়. হযরত খাজা চৌহরভী নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁর লিখিত ৩০ পারা সম্বলিত দুরূদ শরীফ গ্রন্থ 'মাজমূ'আহ্-ই সালাওয়াত-ই রসূল' ছাপানোর কাজ এবং দারুল রহমানিয়া মাদরাসা পরিচালনার জন্য কোন বিহিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি রেঙ্গুনেই অবস্থান করেন। সুতরাং তিনি ১৬ বছর পর স্বদেশে যান। ইতোমধ্যে তিনি ১৯৩০ সনে এত বিশাল পরিসরের কিতাবটির রেঙ্গুন থেকেই প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কাজ সুসম্পন্ন করেন। আর রহমানিয়া মাদরাসার দ্বিতল ভবন নির্মাণ করান। এমনকি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসন এবং শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থাটাও তিনি রেঙ্গুন থেকে করেছেন।

সাত. আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা

১৯২৫ ইংরেজির ১৫ই ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুনের সুলে পেগোড়া সড়কের বাঙালী সুন্নী জামে মসজিদে বসে তাঁর বিশাল দ্বীনী মিশনে নিজের মুরীদরেকে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'আনজুমানে শূরা-ই রহমানিয়া'। এ আনজুমান ২৯ শে আগস্ট ১৯৩৭ ইংরেজি হতে প্রথমে রেঙ্গুনের চট্টগ্রাম শাখা হিসেবে এবং পরে ১৯৪২ ইংরেজি হতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের ভূমিকা পালন করে চট্টগ্রামে। এটা এ নামে কাজ করে দীর্ঘ ৩০ বছর। পরে ২২ জানুয়ারী ১৯৫৪ ইংরেজি সনে 'আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' প্রতিষ্ঠা করা হয় নতুন মাদরাসা বাস্তবায়নের জন্য। এরপর এ দু' আহ্জুমান যুক্ত হয়ে 'আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে (১৮ই মার্চ, ১৯৫৬ইং) এ নামে খ্যাত হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের নাম 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'। এ আনজুমানের অধীনে 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'সহ শতাধিক মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জশনে জুলূসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' প্রতি বছর আয়োজিত হচ্ছে। মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আলমগীর খানকাহ্ শরীফসহ অগণিত খানক্বাহ্, মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে। এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক সংগঠন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ' দ্বীন ও মাযহাবের অসাধারণ খিদমত আনজাম দিচ্ছে। 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রতি বছর অগণিত অতি জরুরী গ্রন্থ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে।

আট.জামেয়া প্রতিষ্ঠা

হুযূর কেবলা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি আলায়হির রাহমাহ্ সত্য প্রতিষ্ঠা ও বাতিল অপসারণের এক স্থায়ী ও যুগান্তকারী ব্যবস্থা করেছেন 'জামেয়া' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জামেয়া প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষপট সম্পর্কে আজ সবাই জানে। বিগত ১৯৪৯ ইংরেজি সালের ডিসেম্বর মাস। মরহুম মাওলানা এজহার উদ্দীনসহ কতিপয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হুযূর ক্বেবলাকে তৈলারদ্বীপ, টইটং, পুঁইছুড়ি ও শেখেরখিল ইত্যাদি এলাকায় সফর করানোর উদ্দেশ্যে দাওয়াত করেন। শেখের খিলের বাসিন্দারা একদিন আসরের নামাযের পর হুযূর ক্বেবলার সফর উপলক্ষে এক ওয়াজ ও মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। হুযূর ক্বেবলাও ওই মাহফিলে সদয় উপস্থিত হলেন। মাহফিলের কয়েকটা বিষয় হুযূর ক্বেবলাকে দারুনভাবে ব্যথিত করলো। একটি হলো হুযূর ক্বেবলার পূর্বে একজন মৌলভী যথানিয়মে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি ছাড়াই বক্তব্য শুরু করে দিলো। এরপর হুযূর ক্বেবলা যখন তাক্বরীর শুরু করলেন তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দুরূদ ও সালাম পড়ার নির্দেশ বিশিষ্ট আয়াত শরীফ "ইন্নাল্লা-হা ওয়ামালা-ইকাতাহু ইয়ূসাল্লূ-না আলান্নাবিয়্যি ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ- সল্লূ-'আলায়হি ওয়াসাসাল্লিমূ- তাসলী-মা-" তিলাওয়াত করলেন। কিন্তু হুযূর ক্বেবলার সফরসঙ্গী ১৫/২০ জন ছাড়া কেউ দুরুদ শরীফ পড়লোনা।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অমান্য, দরূদ শরীফের মতো বরকতমন্ডিত ইবাদতের প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞা ইত্যাদির মতো অশোভন আচরণ দেখে তা নিরবে সহ্য করা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হলেও আল্লাহ্র এক মহান ওলী, অকৃত্রিম আশেক্বে রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কথার বাস্তবতা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রমাণিত হলো হুযূর ক্বেবলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে।

হুযূর কেবলা তাঁর বেলায়তী তীক্ষ্নদৃষ্টি দ্বারা সঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, এ দেশে ওহাবী মতবাদ অনুপ্রবেশ করে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে; সুতরাং এর প্রতিরোধ-প্রতিকারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সুতরাং তিনি তখন থেকেই বাস্তব পদক্ষেপ নিলেন। মাগরিবের নামাযের সময় মাহফিল সমাপ্ত হলো। এরপর মাহফিলে উপস্থিত প্রায় সবাই চলে গেলো। কিন্তু হুযূর ক্বেবলা চুপচাপ বসে রইলেন। কারো সাথে কোন কথা বার্তা বললেন না। এশার নামায হুযূর ক্বেবলা মসজিদে আদায় করলেন। এরপর মসজিদে হুযূর ক্বেবলা তাঁর নূরানী তাক্বরীর শুরু করলেন। এ ওয়া'যে তিনি ওহাবীদের মুখোশ উন্মোচন করতে লাগলেন। দুশ্মনানে রসূলের অশোভন আচরণের

ফলে জন্মানো মনের ক্ষোভ তার নূরানী যবান দিয়ে তাদের 'ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক খন্ডন অগ্নি-স্পুলিঙ্গের ন্যায় বের হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে শানিত তরবারির রূপ নিছিলো। ওহাবীরা নবীর দুরূদ শরীফ পড়লো না। এরপর থেকেই এ দেশে সুন্নিয়াতের আন্দোলন নব উদ্যমে আরম্ভ হলো।

রাতে হুযূর ক্বেবলা খানাপিনা গ্রহণ করেননি। সুতরাং সফরসঙ্গীদের কারো পানাহারও হয়নি। সফর শেষ করে শহরে ফিরে এসে শুরু হলো ওহাবীদের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষের ঈমান বাঁচানোর লড়াই। সুতরাং তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন। সম্ভবতঃ তখনকার সময়েরই হুযূর ক্বেবলার এ যুগান্তকারী নির্দেশ "কাম করো, ইসলামকো বাচাও, দ্বীন কো বাচাও, সাচ্ছা আলিম তৈয়ার করো।" (কাজ করো, ইসলামকে রক্ষা করো, দ্বীনকে রক্ষা করো, সাচ্চা আলিম তৈরী কর।) তারপর মাদরাসার জন্য জমি খোঁজার নির্দেশ দিলেন। হুযূর ক্বেবলা যে বৈশিষ্ট্যাদির জমি চেয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো নাজির পাড়ায়, বর্তমানে যেখানে 'জামেয়া' সমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ! আজ এ জামেয়া উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুন্নী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এ জামেয়া এখন 'কিশ্তী-ই নূহ' (আলায়হিস্ সালাম), জান্নাত-নিশান (বেহেশতসদৃশ)। আল্লামা গাযী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ মাদরাসার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর 'দিওয়ান-ই আযীয' কাব্য গ্রন্থে। তাছাড়া, হুযূর ক্বেবলা এ মাদরাসাকে মানুষের যাবতীয় মুশকিল আসান হওয়ার মাধ্যম বলে আখ্যায়িত করে এর গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন মাদরাসার জন্য মান্নত করো, মান্নতপূর্ণ হলেই মান্নতটুকু পূরণ করো।" আলহামদুলিল্লাহ্! এ পর্যন্ত কারো মান্নত পূর্ণ হয়নি এমন শোনা যায়নি। বলাবাহুল্য, হুযূর ক্বেবলার দো'আর বরকতে প্রতি বছর এ মাদরাসা থেকে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ সুন্নী ওলামা তৈরী হয়ে বের হচ্ছে।

নয়. তিনি এ উপমহাদেশে কাদেরিয়া তরীক্বার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর হাতে এবং তাঁর খলীফা ও উত্তরসূরী হযরতগণের হাতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার বায়'আত গ্রহণ করে অসংখ্য মানুষের ঈমান-আক্বিদার সংরক্ষণ হয়েছে ও হচ্ছে। সর্বোপরি অগণিত মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে তাঁরা সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষে পরিণত হচ্ছে। ফলে, তাঁরা উভয় জাহানে সাফল্যমন্ডিত হচ্ছেন।

দশ. মসলকে আ'লা হযরত প্রতিষ্ঠা

মসলকে আ'লা হযরত হচ্ছে ইসলামেরই প্রকৃত রূপরেখার নাম। ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, সংক্ষেপে সুন্নী মতাদর্শ। ইসলামী বিশ্বে যখন একদিকে অইসলামী বিশ্বাস ও কর্মকান্ডকে বিভিন্নভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার পাঁয়তারা চলছিলো, অন্যদিকে ওহাবী, মওদূদী, আহলে হাদীস, চাকড়ালভী (আহলে ক্বোরআন), শিয়া, রাফেযী ইত্যাদি সম্প্রদায় যখন তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও কর্মকান্ডকে ইসলামী আক্বীদা ও কর্মকান্ডরূপে এমনভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলো, ঠিক তখনই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' (সুন্নী মতাদর্শ)-এর আসল রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্। আর সেটারই অপর নাম 'মসলকে আ'লা হযরত' বা আ'লা হযরতের অনুসৃত পথ। উপমহাদেশে অনেকে মাদরাসা করেছেন, কিন্তু ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের আলিম সেগুলোর মধ্যে অনেক কম সংখ্যক মাদরাসা থেকে বের হচ্ছেন; বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'আলিম-ই সূ' (মন্দ আলিম) বের হয়ে ইসলামকে করছে বদনাম, সমাজকে করছে কলুষিত। তাই, হুযূর ক্বেবলা যেই জামেয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটাকে মসলকে আ'লা হযরতের ভিত্তিতে পরিচালনার নির্দেশ দেন। এর ফলে এ দেশ এমনকি উপমহাদেশের মানুষ একদিকে আ'লা হযরতকে চিনতে পারেন এবং তাঁর মসলকের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

এগার. শাহানশাহে সিরিকোট তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী ও বা-কারামাত বুযুর্গ খলীফা রেখে গেছেন। তাঁর প্রধান খলীফা হুযূর ক্বেবলা হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তাঁর সম্পর্কে হুযূর ক্বেবলা শাহানশাহে সিরিকোট বলেছেন, "আমি রোযা রেখেছি, তৈয়্যব

ঈদ উদযাপন করবে। তৈয়্যব মাদারযাদ ওলী।" (মায়ের গর্ভ শরীফ থেকে ওলী হয়ে এসেছেন) তাছাড়া, তিনি ছিলেন দাদাপীর হযরত চৌহরভী ও আপন পিতা হুযূরের চোখের মণি। তাঁর উত্তরসূরী প্রধান খলীফা আমাদের বর্তমান হুযূর ক্বেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলীও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে মাক্ববূল। বিগত ১৯৫০/৫১ ইংরেজি সালে শাহানশাহে সিরিকোট হজ্জে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি যখন তাজদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওযা-ই পাকে বিদায়ী সালাম পেশ করছিলেন তখন রওযা-ই পাক থেকে আগামীবার হজ্জে আসার সময় তাঁর নাতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেবকে সাথে নিয়ে আসার সদয় নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং তিনি আপন ওই নাতি সাবালক হলে বিগত ১৯৫৮ সালে তাঁকে সাথে নিয়ে হজ্জে গিয়েছিলেন এবং প্রিয় নবীর রওযা-ই পাকে সালাম আরয করেন। ওই হজ্জেই আরাফাতের ময়দানে তাঁকে আপন হাতে হাত রেখে বায়'আত করান এবং ফুয়ূযাতে ভরপুর করে দিলেন। হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী সম্পর্কেও হুযূর ক্বেবলা শাহানশাহে সিরিকোট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আর হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ আলায়হির রাহমাহও একবার বলেছিলেন সাবের শাহকে তোমরা মা'মূলী ব্যক্তিত্ব মনে করোনা। আলহামদুলিল্লাহ্ এ সব বরকতমন্ডিত ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা বিশ্ববাসী দেখেছে ও দেখে যাচ্ছে।

আরো উল্লেখ্য যে, শাহানশাহে সিরিকোট এমন বরকতময় সান্নিধ্য, শিক্ষা ও তরীকা দিয়ে গেছেন, যেগুলো যাঁরা গণীমত মনে করে সেগুলোর প্রতি নিষ্ঠার সাথে গুরুত্বারোপ করেছেন, তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রিয় হয়েছেন ও হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দুনিয়াবী উন্নতির কথাতো সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছেই। তাঁদের মধ্যে আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী, আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর, আলহাজ্ব ডা. টি. হোসেন, আলহাজ্ব আমিনুর রহমান সওদাগর, আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, আলহাজ্ব মাস্টার আবদুল জলীল, আলহাজ্ব সূফী আবদুল গফূর, শায়খ আফতাব উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখের নাম শীর্ষে। তাঁদের মধ্যে অনেকে সরাসরি আল্লাহর হাবীবের দীদার (সাক্ষাৎ) পেয়েছেন। এভাবে এ তরীক্বতে নিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অগণিত মানুষ ধন্য হয়েছে এবং আগামীতেও হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই, এ ফিতনার যুগে শাহানশাহে সিরিকোটের বরকতমন্ডিত এ মিশনের সাথে সম্পৃক্ত হবার বিকল্প পথ আছে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া হযরত শাহানশাহে সিরিকোট যে বহু উঁচুস্তরের ওলী ছিলেন তা তাঁর অগণিত কারামত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাই এ নিবন্ধে কয়েকটা কারামত উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

এক. হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি আলায়হির রাহমাহ অসংখ্য কারামতের আধার ছিলেন। তন্মধ্যে একটি হলো তাঁর মধ্যে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম-এর প্রভাব ছিলো। তিনি যখন কোন ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন যে কারো দ্বারা তা বাস্তবায়ন করতেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত ছিলেন মরহুম ফজলুর রহমান। একদিন সকালে তিনি বাজার করার জন্য হুযূর ক্বেবলার নিকট টাকা চাইলেন। হুযূর ক্বেবলা অপেক্ষা করতে বললেন। হুযূর ক্বেবলা দোতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেলো। বাবুর্চি ফজলুর রহমানের অপেক্ষা ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। এক সময় দেখলেন এক অতি সুন্দর নূরানী চেহারাধারী আগন্তুক এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি বিদায় নিলে হুযূর ক্বেবলা বাবুর্চিকে ডাকলেন এবং কিছু টাকা দিয়ে বাজার যেতে বললেন। বাবুর্চিও আগন্তুক লোকটার পরিচয় জানার জন্য একটি বাহানা করলেন। তিনি বললেন, "আজ বাজারে যাবো না, প্রয়োজনে ভূখা থাকবো, যতক্ষণ না লোকটার পরিচয় বলেন।" হুযূর ক্বেবলা বললেন, "আমার নিকট টাকা ছিলোনা। তাই তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত খিযির আলায়হিস্ সালাম এসে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। বাবুর্চি ফজলুর রহমান খুশী মনে বাজারে গেলেন।

দুই. রেঙ্গুনের নামকরা মদ্যপ দুশ্চরিত্র কাকা সরদার হুযূর ক্বেবলা শাহানশাহে সিরিকোটের নেক নজরে

একজন কামিল ইনসানে পরিণত হয়েছিলেন। একদিন ভোরে হুযূর ক্বেবলার নিষ্ঠাবান মুরীদ ও খলীফা সূফী আবদুল গফুর হুযূর ক্বেবলার পেছনে ফজরের নামায পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাকা সরদার সামনে পড়লো আর বললো, "সূফী সাহেব, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বললেন, "নামায পড়তে মসজিদে যাচ্ছি।" কাকা সর্দার বললো, "সেখানে কি পাওয়া যায়?" সূফী সাহেব বলে ফেললেন, "সেখানে জান্নাত পাওয়া যায়।" সর্দার বললো, "আমারও জান্নাত চাই। আমিও তোমার সাথে যাবো।" সুতরাং সে তাই করলো।

মুসল্লীরা সূফী সাহেবের সাথে কাকা সর্দারকে আসতে দেখে প্রমাদ গুণতে লাগলেন। জানিনা আজ কি ঘটে! সর্দার মসজিদের বাইরে বসে রইলো। নামায সমাপ্ত করে হুযূর ক্বেবলা মুসল্লীদের নিকট বয়ান করার জন্য তাশরীফ আনলে কাকা সরদারকে দেখলেন। তাকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাস করলেন। কাকা বললো, সূফী সাহেব বলেছেন "এখানে জান্নাত পাওয়া যায়। আমারও জান্নাত চাই।" হুযূর বললেন, "ঠিক আছে। ওযূ করে এখানে বসে যাও। প্রথমে বায়'আত করে নাও। তারপর জান্নাত মিলবে।"

সুবহানাল্লাহ্! একথা শুনে সর্দার বললো, "আমার একটা শর্ত আছে, 'আমি শরাবখানায়ও যাবো, বেশ্যালয়েও যাবো'।" আমার শর্ত মানলে আমি বায়'আত করে নেবো।" হুযূর বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোমার শর্ত মেনে নিলাম; কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। সেটাও তোমাকে মানতে হবে।" সর্দার ভাবলো, হুযূর আর কি শর্ত দেবেন। আমিও তা মেনে নেবো বৈ-কি?" আর বললো, "ঠিক আছে। বলুন, আপনার কি শর্ত?" হুযূর ক্বেবলা বললেন, "শূয়রের বাচ্ছা দেখলে ওই শরাব পান করবে না। আর আমার সামনে দিয়ে বেশ্যালয়ে যাবে না।" সে ভাবলো, "শরাবের মধ্যে শূয়রের বাচ্চা আসবে কোত্থেকে?" আর হুযূর থাকবেন মসজিদে। আমি রাতের বেলায় বেশ্যালয়ে যাবো। হুযূর কিভাবে দেখবেন? সে বললো, "হ্যাঁ পাক্কা ওয়াদা! আমি শর্ত দু'টি মেনে নিলাম।"

হুযূর তাঁকে বায়'আত করালেন আর তার হিদায়তপ্রাপ্তির জন্য দো'আ করলেন। সর্দার বিদায় হয়ে গেলো। সবার মনে প্রশ্ন হুযূর এটা কি করলেন। এমন নামকরা গুন্ডা, মদ্যপ ও রন্ডিবাজকে এভাবে বায়'আত করালেন! দেখা যাক, গাউসে যমান কি করতে পারেন? যথারীতি সন্ধ্যায় সর্দার শরাব খানায় গিয়ে সাগ্রহে শরাবের অর্ডার দিলো। মদের বোতল আর গ্লাস পরিবেশন করা হলো। সর্দার গ্লাসে মদ ঢেলে পান করার জন্য উদ্যত হলে দেখতে পেলো শরাবের গ্লাসে শূয়রের বাচ্চা ছুটাছুটি করছে। সর্দার তা ছুঁড়ে মারলো। তারপর গ্লাসের পর গ্লাস আনা হলো; কিন্তু সব ক'টিতে একই অবস্থা। সর্দার শরাব পান না করে এবার বেশ্যালয়ের দিকে রওনা হলো। এখানে এসে দেখতে পেলো বেশ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে হুযূর ক্বেবলা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর এ পথ ও পথে গিয়েও দেখতে পায় সব ক'টি পথে ও রাস্তার মাথায় হুযূর ক্বেবলা লাঠি হাতে দন্ডায়মান। হতাশ, নিরুপায় হয়ে মসজিদের দিকে এসে দেখতে পেলো, হুযূর ক্বেবলা নামাযের মুসল্লায় বসা আছেন। এভাবে ভোর হয়ে গেলো। ভোরে সর্দার উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে মসজিদে গিয়ে হাযির হলো। নামায শেষে হুযূর ক্বেবলা বললেন, "সর্দার তোমার কি অবস্থা?" সর্দার বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে করজোড় ক্ষমা চাইলো আর খাঁটি নিয়্যতে তাওবা করে নিলো। এ-ই কাকা সর্দার রেঙ্গুনে হুযূর ক্বেবলার প্রতিনিধি হয়ে দ্বীন ও মাযহাবের অনেক খিদমত আঞ্জাম দেন। এভাবে অনেক কারামত হুযূর ক্বেবলা শাহানশাহে সিরিকোট থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো। হুযূর ক্বেবলার জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন এখন সমাপ্তির পথে। তাতে অন্যান্য কারামত ও অবদান সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ত প্রজ্ঞা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রকৃত ভালবাসা এবং অসাধারণ বেলায়তী শক্তি দ্বারাই দ্বীন, মাযহাব এবং হিদায়তের ক্ষেত্রে অসাধারণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্য ও বরকত পেয়ে আজ অগণিত ভাগ্যবান মানুষ ধন্য।।

লেখক: মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গঃ যঈফ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা

মুফতি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আল ক্বাদেরী

ইদানিংকালে বেশি বেশি বলতে শোনা যায়– হাদিসটি সহীহ কিনা! প্রশ্নকর্তা বিজ্ঞ আলেম না হলেও অর্ধশিক্ষিত থেকে শুরু করে সাধারণ কিছু জনগণ। তাদের কথা থেকে বুঝা যায় সহীহ হাদিস ব্যতিত অন্যান্য সকল হাদিস আমলযোগ্য নয় কিংবা মানা যাবে না। সর্বোপরি সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। সহীহ হাদিস ছাড়া হাসান লি-জাতিহী, হাসান লি-গায়রিহী সহ অপরাপর হাদিস সমূহ তাদের নিকট গুরুত্বহীন, আর যঈফ হাদিসের পাত্তাও নেই এ সকল ব্যক্তিদের কাছে। কেবল সহীহ হাদিস হলে চলবে না, তাও বুখারি শরিফ থেকে হতে হবে! হাজার বছরেরও বেশি সময়কালে উম্মতে মোহাম্মদীর কোন হাদিস ও ফিকহ বিশারদ বা পন্ডিত কিংবা হাদিস নিরীক্ষক যে কথা বলেননি, আজকাল মুসলিম সমাজে তা বলা ও প্রচার করা দুঃখজনক নয়, দ্বীনের জন্য অশনি সংকেত এবং মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মবিমুখ করা এর অন্যতম কারণ।

যঈফ (দুর্বল) হাদিসকে মাওযু (বানোয়াট) মনে করে থাকে এক বিশেষ শ্রেণীর লোক। তাদের কথায় প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে, আদার বেপারীর জাহাজের খবর নেওয়া। এমন ভাব দেখায় যে, তারাই হাদিসের ধারক-বাহক, তারাই হাদিসের এজেন্ট, তারাই হাদিস সঠিকভাবে বুঝে এবং সহীহ তরিকায় আমল করে। হাজার বছর যাবত যারা হাদিস গবেষণা ও চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তারা এদের নিকট শিষ্যতুল্যও নয়। তাইতো প্রশ্ন করে 'এটি দু'ফ মুক্ত সহীহ হাদিস কিনা' এ ভঙ্গিতে। যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে দীর্ঘকায় হাদিসের শিক্ষা লাভ না করে, গবেষণা ও চর্চা ছাড়াই হাদিস গবেষক ও পন্ডিত বনে যাওয়া তাদের তেলেসমাতি নাকি অন্য কিছু তা বুঝে ওঠা মুশকিল। না বুঝে, না জেনে দ্বীনি বিষয়ে ওকালতি করা মহাবিপদ! যার বাস্তবতা বর্তমানে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে এবং মুসলিম সমাজ ক্রমাগত কলুষিত হচ্ছে।

স্মর্তব্য যে, হাদিসের একটি প্রকার যঈফ হাদিস। মানাকেব ও ফাযায়েল তথা মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে তা সকল ইমামদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। এমনকি একাধিক সূত্রে বর্ণনার ফলে তা শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য পর্যায়ে পৌছে যায়। হাদিসের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত বিষয়ে পারদর্শী ও সর্বজন বিদিত ইসলামি মনীষীদের অভিমত সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস চালাব এতদবিষয়ে, যাতে যঈফ হাদিসের ব্যাপারে সঠিক তত্ত্ব ও ধারণা পাওয়া যায় এবং হাদিস অমান্যকারী লা-মাযহাবী ষড়যন্ত্রের ফাঁদ থেকে বাঁচা যায়। যা এ যাবতকালের জঘন্যতম ফিতনা।

ফযিলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিসের ওপর আমল সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ

নবম হিজরীর মুজাদ্দিদ উপাধীতে ভূষিত, বিখ্যাত তত্ত্ববিদ, দার্শনিক, হাদিসসহ সকল শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে, "আমার রায় হচ্ছে মহান রব প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত মাতাকে জীবিত করা সংক্রান্ত হাদিসটি মাওযু বা জাল নয়, যা হাফিযুল হাদিসগণের এক জামায়াত দাবি করেছেন, বরং হাদিসটি যঈফের পর্যায়ভুক্ত, যা শিথিলতা করা হয় ফযিলতের ক্ষেত্রে।"[১]

বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী, শরিয়ত-মারেফত ও হাদিস সমুদ্রের সফল ডুবুরী ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এমনিকরে ব্যক্ত করেন, "হাদিস বিশারদগণ ও অন্যান্যদের নিকট যঈফ সনদের বিষয়ে সহনশীলতা দেখানো এবং ফযিলতপূর্ণ আমল ও অন্যান্য বিষয়ে মাওযু ব্যতিত যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা বৈধ, যা আক্বিদা ও বিধি–বিধানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যে সকল হাদিসবেত্তাগণ থেকে এ বিষয়টা উদ্ধৃত তাদের মাঝে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনু মাহদী ও আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক অন্যতম। তাঁরা বলেন- যখন আমরা হালাল-হারাম বিষয়ে হাদিস বর্ণনা করি তখন কঠোরতা অবলম্বন করি আর ফযিলতের বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করি।"[২]

সমগ্র বিশ্বের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, হাদিস শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তির অধিকারী, সহীহ মুসলিমের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাদাতা আল্লামা ইমাম নাওয়াভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ বিষয়ে

[১]- আল হাবি লিল ফতওয়া খন্ড-০২,পৃ-১৯১।
[২]- তাদরীবুর রাবী, খন্ড-০১, পৃ.-০১।

চূড়ান্ত মতামত তুলে ধরে ব্যক্ত করেন এভাবে– قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال অর্থাৎ, ফযিলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা বৈধ, উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে।[৩]

এ বিষয়ে বরেণ্য ইসলামি মনীষী ইমাম আবু তালিব মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হির অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর কুওয়াতুল কুলুব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন এমনিভাবে, "ফযিলতপূর্ণ আমল ও সাহাবীগণের ফযিলত এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে বর্ণিত যে কোন হাদিস যে কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য যদিও তা মাকৃতুহ ও মুরসাল হাদিস হয়ে থাকে। এটার বিরোধিতা করা যাবেনা, না রদ করা যাবে। পূর্ববর্তী ইমামগণ এ ভাবেই বলেছেন।"[৪]

যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা মোস্তাহাব তথা উত্তম

সাধারণভাবে যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা অবশ্যই বৈধ, যা উল্লেখিত ইমামগণের উদ্ধৃত মতামতের আলোকে প্রমানিত। এমনকি হাদিস বিশারদগণ ও বিখ্যাত আলেমগণ স্পষ্টভাবে এ কথাও ব্যক্ত করেছেন যে– হাদিস মাওযু' (বানোয়াট) পর্যায়ের না হলে ফযিলত-মর্যাদা ও আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিসরে ওপর আমল করা কেবল বৈধ না, বরং উত্তমও বটে। বিষয়টা খ্যাতিমান ও বিদগ্ধ পন্ডিতগণের অভিমতে প্রতিভাত হয়। বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা ইমাম নাওয়াভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির কলমে দেখা যাক। তিনি বলেন," আলেমগণ, হাদিসবিশারদগণ, ফকিহগণসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ অভিমত প্রদান করেছেন যে, ফযিলত, উৎসাহপ্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনে যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা বৈধ, বরং মোস্তাহাব তথা পছন্দনীয়, যদি তা মাওযু পর্যায়ভুক্ত না হয়।"[৫]

ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বক্তব্য থেকে বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয় এভাবে,"অনেক ইমাম তালকীনকে বিদায়াত আখ্যা দিয়েছেন। সর্বশেষ এ রায় প্রদান করেছেন ইজ্জুদীন আব্দিস সালাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি। আর এটাকে ইবনুস্ সালাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি মুস্তহাব বলেছেন। ইবনুস সালাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উক্ত অভিমত ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গ্রহণ করেছেন। এ ইমামদ্বয়ের তালকীন মুস্তাহাব বলার কারণ হলো ফযিলত ও তাৎপর্যপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিসের ওপর আমল করা বৈধ।[৬]

যঈফ হাদিস কখনো হাসান পর্যায়ভুক্ত হয়

যঈফ হাদিসের ওপর আমল বৈধ ও মুস্তাহাবের পাশাপাশি তা কখনো 'হাসান' পর্যায়ে পৌছে যায়। হাদিস গবেষকগণ বলেন, একাধিক বর্ণনা সূত্রের ফলে শক্তিশালী হয়ে যঈফ হাদিস নির্ভরযোগ্য হাদিস তথা হাসান এর অন্তর্ভুক্ত ও স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। খ্যাতিমান হাদিস ও ফিকহ বিশারদ আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন- تعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف الى حد الحسن অর্থাৎ, একাধিক বর্ণনা যঈফ হাদিসকে হাসান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।[৭]

বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ আল্লামা ইবনুল হুমাম চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন এভাবে- لو ثبت تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثرتها অর্থাৎ, যদি সাব্যস্থ হয় হাদিসের সকল রাবী দূর্বল তারপরও একাধিক বর্ণনা ও আধিক্যের কারণে হাদিস হাসান পর্যায়ে চলে যায়।[৮]

সূর্যসম প্রতিভার যোগ্য, বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী, মহাপন্ডিত ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বিষয়টা উৎকর্ষ সহকারে তুলে ধরেন এভাবে, "বহুসংখ্যক বর্ণনার ভিত্তিতে মাতরুক ও মুনকার হদিসও যঈফ, গরীব পর্যায় এমনকি কখনো হাসান পর্যায়ে উন্নত হয়।"[৯]

বিষয়টি আরও ধ্রুপদী করে তুলে ধরেন বিশ্বজোড়া খ্যতির অধিকারী ইমাম আবদুল ওহাব শা'রানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি উল্লেখ করেন, " হাদিসবেত্তাগণ একাধিক বর্ণনার ফলে যঈফ হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কখনো এটাকে তাঁরা সহীহের সাথে কখনো হাসানের সাথে সংযুক্ত করেন। এ ধরনের যঈফ হাদিস ইমাম বায়হাকীর সুনানে কুবরায় বহু বিদ্যমান। মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব ও বক্তব্যের দলিল প্রদান লক্ষ্যে তিনি তা রচনা করেন।"[১০]

---

[৩]- শরহে আরবাঈন পৃ.-০৫।
[৪]- কুওয়াতুল কুলুব, পৃ.-৬৩১, ১ম খন্ড।
[৫]- কিতাবুল আযকার, পৃ:০৬।
[৬]- আল হাবী লিল ফতওয়া,২য় খন্ড,পৃ.-১৯১।
[৭]- মেরকাত, ১ম খন্ড, পৃ.-১৮।
[৮]- শরহু ফাতহিল কাদির, ১ম খন্ড, পৃ.–৩০৬।
[৯]- আত্তাহকুবাত আলাল মাওয়ুয়াত, পৃ.-৭৫
[১০]- আল মিযানুল কুবরা, খন্ড:০১, পৃ.-৬৮।

সহীহ হাদিস থেকেও কখনো যঈফ হাদিস অগ্রাধিকার প্রাপ্ত

একাধিক বর্ণনার কারণে সহীহ হাদিসের পর্যায়ভুক্ত হয় যঈফ হাদিস, যা ইতিমধ্যে ইমাম শা'রানীর বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয়। এ বক্তব্য শুধু তাঁর নয়, আরও অনেকের। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে সহীহ হাদিসের মোকাবিলায় যঈফ হাদিসেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ সনদের বিচারে হাদিস যঈফ বা দূর্বল হলেও এর ওপর উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমলের ফলে হাদিসটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়। এমনকি এ ধরনের যঈফ হাদিস প্রাধান্য পায় সহীহ হাদিসের মোকাবিলায়। এ রীতি ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ অন্যান্যরাও অনুসরণ করেছেন। একটিমাত্র উদাহারণ পেশ করব বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝার লক্ষ্যে।

আবুল আস অমুসলিম অবস্থায় প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে হযরত যয়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ হয় এবং প্রথম দিকে হিজরত না করে আবুল আস মক্কা শরিফে থেকে যান। ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীতে মদিনা শরিফে আসার ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন চলতে থাকে। কিন্তু তাদের বিয়ে কি নবায়ন করা হয়েছে নাকি পূর্বের বিয়ে বহাল ছিল এ মর্মে দুটি হাদিস পাওয়া যায়–

1- عن ابن عباس قال رد النبى صلى الله عليه وسلم ابنته على ابى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث النكاح-

(১) অর্থাৎ, ছয় বছর পর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নাবকে স্বামী আবিল আস বিন রবীয়ি এর নিকট পূর্বে বিয়ে বহাল রেখে ফিরিয়ে দেন। আর বিয়ে নবায়ন করা হয়নি। [তিরমিযি, হা: নং-১১৪৩]

2- عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى عليه وسلم رد ابنته على ابى العاص الربيع بمهر جديد ونكاح جديد-

(২) অর্থাৎ আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে নতুন মোহরানা নির্ধারণপূর্বক নতুন বিয়ের মাধ্যমে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেন।

[তিরমিযি, হা: নং-১১৪২]

বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের মাঝে প্রথমটি অধিক সহীহ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদিস যঈফ তথা দুর্বল। বিধানগত দিক দিয়ে একটি অপরটির বিপরীতমুখী। প্রথমটি থেকে প্রমাণিত পূর্বের বিয়ে বহাল রয়েছে, নতুন বিয়ের প্রয়োজন হয়নি। এটার সম্পূর্ণ বিপরীত দ্বিতীয় হাদিসটি। সহীহ হবার ফলে প্রথমটির ওপর আমল প্রাধান্য থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। একই পরিচ্ছেদে উভয় হাদিসকে ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করে পর্যালোচনা পূর্বক কী সমাধান দিয়েছেন এবং হাদিসের ওপর সঠিক আমল করার প্রক্রিয়া কী? শুধু সহীহ হলেই আমল যথেষ্ট কিনা তা ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলায়হির বক্তব্য থেকে জানা যাক। ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাদিস দু'টির বর্ণনার শেষে উল্লেখ করেন–

قال ابو عيسى قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب-

অর্থাৎ, সনদের বিচারে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসটি অধিক তথা উচ্চমানের সহীহ। কিন্তু (ইমামগণের অব্যাহত আমলের ভিত্তিতে) দ্বিতীয় হাদিস যঈফ হওয়ার পরও আমলযোগ্য ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

[তিরমিযি, পৃ.-৮১, ৩য় খন্ড]

অতএব যঈফ হাদিস কখনো সহীহ হাদিসের ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়, যা উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান।

এমনি করে মুসলিম উম্মাহ যঈফ হাদিসকে ব্যপকভাবে গ্রহণ করলে দূর্বল হাদিসটি বিপুল সংখ্যায় বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সর্বাধিক সহীহ হাদিসের স্তরে পরিগনিত হয়ে যায় বিধায় তা অবশ্যই গৃহীত ও আমলযোগ্য। আর এটাই সঠিক রীতি-নীতি। এ বিষয়ে সবিস্তার উদ্ধৃত হয়েছে ইমাম যারকাশী রহমাতুল্লাহি আলায়হির 'আন্নুকাত আলা কিতাবে ইবনুচ ছালাহ', ইমাম শামছুদ্দিন সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হির 'শরহু আলফিয়াতিল হাদিস', লা-মাযহাবীদের মান্যবর আলেম ইবনুল কায়্যিমের 'আররূহ' সহ অন্যান্য গ্রন্থে। কাজেই যঈফ হাদিস যাদের কছে গুরুত্বহীন, তারা একদিকে যঈফ হাদিসের ভান্ডারকে অস্বীকার ও অমান্য করে, আর দাবী করে তারাই হাদিসের ওপর সঠিক আমলকারী। অন্যদিকে অনেক যঈফ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত দয়াল নবিজি সহ সম্মানিত সাহাবীগণ ও আউলিয়া কেরামের শান-মান-সম্মান-মর্যাদাকে আড়াল ও বর্জন করে। এটাই তাদের আসল চেহারা।

লেখক: মুফতি- কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

যুগবরেণ্য মুহাদ্দিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী

রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

হাদীস (حديث) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নবী করীম রউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নূরানী মুখনিঃসৃত বাণী, তার কাজ, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে এবং তাবি'ঈনে ইযাম রহমাতুল্লাহি আলায়হিমার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয় ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়।

মূলত حديث শব্দটি আল-কুরআনের বাণী وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (আর আপনার রবের নে'মাতের কথা খুব প্রচার করুন, ৯৩:১১) থেকে নির্গত। হাদীস শব্দটি ক্বাদীম বা পুরাতনের বিপরীত অথবা হাদীস অর্থ নশ্বর, ক্বাদীম অর্থ অবিনশ্বর। আর মুহাদ্দিস বলতে আমরা বুঝি।

المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها ومن ابرزهم البخارى ومسلم وابوداؤد والترمذى وابن ماجه وغير من ذلك

অর্থাৎ তিনি ইলমে হাদীস বিশেষত: হাদীস বর্ণনা, হাদীসের সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম বিষয় নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি বেশি পরিমাণ হাদীস সম্পর্কে, হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে অবগত থাকেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনে মাজাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি অধিক প্রসিদ্ধ।' اَلْمُحَدِّثُ এখানে (د) বর্ণের উপর যের দিলে হাদীস বিশারদ, হাদীসবেত্তা, হাদীস গবেষক ইত্যাদি অর্থ হয়ে থাকে। আর যদি (د) বর্ণের উপর যবর দিয়ে পড়া হয় اَلْمُحَدَّثْ তখন হবে, ইলহাম অর্থাৎ সাহিবে কাশফ। মুহাদ্দিসকে আবার শায়খুল হাদীস (شيخ الحديث)ও বলা হয়। মূলতঃ شيخ শব্দটি একবচন, বহুবচনে شيوخ বলা হয়। এর অর্থ বয়োবৃদ্ধ, ভদ্রলোক, সম্মানিত ব্যক্তি উস্তাদ ও অধ্যাপক ইত্যাদি। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন," বয়স্ক লোক, প্রধান ব্যক্তি শেখ, সিনেট-সদস্য সিনেটর প্রভৃতি ।

Hans Wehr বলবে, Title of the ruler of any one of sheikh do me along the persian gulf, professor of spiritual Institutions of higher learning Title of the Grand Mufti, The spiritual head of Islam.

মুফতি আমীমুল ইহসান রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইলমে হাদীসের পরিভাষায়, শায়খ ওই হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন, অধিকাংশ সময় হাদীস শিক্ষা গ্রহণে, হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে এবং হাদীস শিক্ষাদানে নিমগ্ন থাকেন, নিজের উস্তাদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে যাঁর অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে। এরূপ হাদীস বিশেষজ্ঞকে মুহাদ্দিস বা ইমাম ও বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার বড় ইহসান হল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস তথা কথা বাণীসমূহ অবিকল আমাদের পর্যন্ত পৌছা, বিশেষ করে নির্ভরযোগ্য সিক্বা রাবীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ মুত্তাসিল-সংযুক্ত সনদ তথা বর্ণনাকারী পরম্পরায় হাদীসে নববী আমরা পেয়েছি। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কুতুবুল আউলিয়া, গাউছে যামান সৈয়দ আহমদ সিরিকোট রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রতি যিনি এশিয়াখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা করে নুরাণী নবীর ইলমের নূরের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছেন। সে নূরের আলোয় নিজের অস্তিত্বকে বিলিন করে ফানা ফীশ শায়খ স্তরে উপনীত হয়ে অমর হয়ে রয়েছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর. খোদাভীতি, নবীপ্রেম, হুব্বে রাসূল, হাদীসে রাসূলের প্রতি আন্তরিক মুহাববত, খুলুসিয়াত, জামেয়া, আনজুমান, সিলসিলা, গাউছিয়া কমিটি, মসলকে আলা হযরত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার উপর এস্তেকামাত, মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠনে তাঁর ভূমিকা আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। খানেকায়, মসজিদে, মাঠে-ময়দানে, সুন্নী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় দ্বীন ও মাযহাবের কল্যাণ সাধনায় তার তাকরিরাত, ওয়ায-নসীহতে এক অনন্য ভূমিকা

রাখলেও তিনি যে কারণে স্বমহিমায় ভাস্বর তাহল ইলমে হাদীস প্রচার-প্রসারে তার কালজয়ী কীর্তিমান অবদান। তিনি ১৯৬৬ খৃ. সাল থেকে ছাত্রদেরকে ইলমে দ্বীন তথা কুরআন, হাদীস, আকাইদ, ফিকহ, ফাতওয়া শিক্ষা দিয়েছেন আন্তরিকতার সাথে। বিশেষ করে ১৯৬৮ খৃ. সালে এশিয়াখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ায় যোগদান করে এক অনবদ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ জামেয়াতে তিনি ৫২ বছর ব্যাপী ছাত্রদের ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীস বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য ও দক্ষতা দেখার মত। তাঁর বিশুদ্ধ সনদে হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পঠন-পাঠনে তাঁর চমৎকার বর্ণনাশৈলী ছাত্রদেরকে বিমোহিত করেছে। প্রথমতঃ তালেবে হাদীস তার সামনে হাদীসের ইবারত পাঠ করতেন। তিনি সেগুলোর তরজমা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, দ্বন্দযুক্ত হাদীসের চমৎকারভাবে সমাধান দিতেন, হাদীসের সনদের বর্ণনা দিতেন, রাবী বা বিভিন্ন পরিভাষা বলতেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতেন, বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। মিশকাত শরীফ, নাসাঈ শরীফ, বুখারী শরীফ, ও তাহাভী শরীফ তাঁর পাঠ্য ছিল। একজন যোগ্য শায়খুল হাদীসের যত গুণাবলী থাকার দরকার সবগুলোই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। আমার বড় সৌভাগ্য হল ১৯৮২ খৃ. সাল থেকে তাঁর সাথে এ জামেয়াতে খেদমত করার সুযোগ লাভ করা। তাঁর কথাবার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, আদব-লেহায, বিনয়-নম্রতা, সহপাঠিদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভক্ত-অনুরক্তদের প্রতি মায়া মাখা কথা সবই তাঁকে করেছে অসাধারণ। তিনি আমাদের অভিভাবকতুল্য ছিলেন। তাঁকে হারিয়ে আমরা মুরব্বি হারা হয়ে গেলাম। এখানে একথা বলা সঠিক হবে যে, জামেয়াকে পেয়ে শেরে মিল্লাত যেমন ধন্য হয়েছেন ঠিক তেমনি নঈমী সাহেবকে পেয়ে জামেয়াও ধন্য হয়েছে। তিনি ২০০৮ খৃ. সালে সরকারীভাবে অবসর নিলেও হুযুর কেবলা (মু.জি.আ.) ও আন্‌জুমান কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবসর দিতে সম্মত হননি। বরং তাঁকে আজীবন জামেয়াতে শায়খুল হাদীস পদে সমাসীন করে দিয়েছেন। তিনিও আন্তরিকতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইলমে হাদীসের দরস, সকাল ৮ ঘটিকায় তাখাস্‌সুস ঘন্টা, ক্লাস টাইমে সিডিউল ক্লাস, আবার মাগরিবের পর আলমগীর খানেকা শরীফে বুখারী শরীফের দরস দিতেন রাত ১০/১১টা পর্যন্ত। তার মাঝে আমরা ক্লান্তি বা অলসতা কখনো দেখিনি । মূলত : তাঁর বড় একটা যোগ্যতা হল সারা রাত জেগে মাহফিল করা, কিতাব দেখা আবার দিনভর ক্লাস করা, বড় আশ্চর্যের বিষয় বটে। মাশায়েখে কেরামের এটা নেগাহে করম।

আমি তাঁর সাথে ১৯৮২ খৃ. সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছর যাবৎ এক সাথেই ছিলাম। বোখারী শরীফের খতমে আমি অনেক সময় ফজিলত বর্ণনা করতাম। তিনি মুনাজাত করতেন। তা্র মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে তা একজন আলেমে দ্বীন, মুহাক্কিক, মুদাক্কিক, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, মুফতি, ফকীহ, মুনাযির ও মুত্তাকী হিসেবে বিবেচিত। তাঁর ইন্তেকালে আমাদেরকে শোকাহত করেছে বটে তবে তাঁর যোগ্য ছাত্রদের পদচারণায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মাদরাসা, কলেজ, ইউনির্ভাসিটি, জজকোর্ট, হাইকোর্টসহ প্রতি সেক্টরে মুখরিত তিনি যে মশাল প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন তাঁর আলোয় উদ্ভাসিত ধরণীতল।

পরিশেষে বলতে পারি শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদীস মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন একজন আলোকিত সাদা মনের মানুষ। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য আমাদেরকে বিমোহিত করেছে, তার খোদাভীতি, ত্যাগ তিতিক্ষা একনিষ্ট খুলুছিয়াত, ভাবগাম্ভীর্যতা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর ইশকে রাসূল নবী প্রেম ও একাগ্রতা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করেছে। তিনিই আমাদের যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসে আযম শাইখুল হাদিস মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর প্রথম ওফাতবার্ষিকীতে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং রফদে দারাজাত কামনা করি, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে আ'লা মকাম নসীব করুন। আমিন। বেহুরমতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

লেখক: শায়খুল হাদীস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মাওলানা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস-এর সমষ্ঠি উসূলে আরবা'আ গবেষণা করে ফিকহি মাসআলা সমাধান দেয়া একজন ফক্বীহর প্রধান দায়িত্ব। মুসলিম বিশ্বে যুগে যুগে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ও হবে, সেগুলোর সমাধান দেয়া মূলতঃ অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। ফক্বীহ, কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা-কিয়াসের আলোকে যে সমাধান দিয়েছেন ও ভবিষ্যতে দেবেন তা জনসম্মুখে লিখিত বা মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া মুফতির পরম ও পবিত্র দায়িত্ব। হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুফার রহমাতুল্লাহি আলায়হিম পৃথিবীর অধিকাংশ মাসআলা-মাসায়িলের সুন্দর সমাধান উপস্থাপন করেছেন, সে সমাধানগুলো হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছয়টি বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরবর্তী যুগের ফোকাহায়ে কেরাম এ কিতাবগুলোর উপর ভিত্তি করে ফিক্বহ্ ফতওয়ার আরো গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে হানাফী মাযহাবকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করেছেন।

প্রত্যেক যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান দেওয়ার জন্য মুফতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদীস ওবাইদুল হক নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুফতি ছিলেন। তিনি ১৯৬২ ও ১৯৬৪ খৃ. সালে দু' দফা পশ্চিম পাকিস্তানের জামেয়া ন'ঈমীয়ার তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির, মুফতী ও মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সান্নিধ্যে থেকে এ বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাছাড়াও ১৯৬৬ খৃ. সালে ঢাকা আলিয়া হতে ফিকহ বিষয়ে উচ্চতর সনদ অর্জন করেন। ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আবেদনকারী থেকে প্রশ্নটি লিখিতভাবে নিতেন যাতে করে প্রশ্নকর্তা নিজ অবস্থান থেকে সরে যেতে না পারেন। এটা তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। তারপর তিনি হানাফী মাযহাবের অভিমত অনুসারে ফতওয়া দিতেন। ফতওয়া দেয়ার বেলায় তিনি হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিসহ রেফারেন্স দিতেন। বিশেষ করে কুদুরী, শরহে বেকায়া, হেদায়া, ফাতওয়ায়ে আলমগীরি, ফাতওয়ায়ে শামী, ফতওয়ায়ে কাযী খাঁন, ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া, বাহারে শরীয়ত, ফতওয়ায়ে রজভীয়াসহ আরো বহু গ্রন্থের হাওলা সহকারে ফতওয়া দিতেন। কেউ কোন দিন তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া রদ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। মূলতঃ তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী, প্রখর স্মৃতি শক্তি, আপন মুরশিদের প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা, আওলাদে রসূলের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত, দরস-তাদরীসে একনিষ্ঠতা, দ্বীন ও মিল্লাতের প্রতি আন্তরিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাতিলের প্রতি আপোষহীনতা, প্রিয় নবীর প্রতি প্রচন্ড ইশক ও মুহাব্বত, দায়িত্বশীলতা, কর্মদক্ষতা, বাকপটুতা, তেজস্বীতা, সর্বোপরি মিষ্ট ব্যবহার তাঁকে অতুলনীয় করেছে। তাঁর চমৎকার তকরীরগুলো আমাদেরকে বিমোহিত করত। তার পাঠদান আমাদেরকে চমৎকৃত করত। পান্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলো আমাদের হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করত। কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলে কুরআন-হাদীস ও ফিক্বহের কিতাব থেকে একের পর এক দলীল উপস্থাপন, সারগর্ভ আলোচনা, যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী বক্তব্য শ্রোতার মন জয় করে নিত।

বাতিলের সাথে কোন মুনাযিরায় তিনি পরাজিত হননি। ইমাম শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে রপ্ত করা টেকনিক দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতেন, ইমাম হাশেমী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইলমের ওয়ারিস ছিলেন আল্লামা নঈমী, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী থেকে পাওয়া মিরাসগুলো চমৎকারভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি শুধু একজন দক্ষ মুফতী ছিলেন তা নয়, তিনি সমানভাবে একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও শায়খুল

হাদীস ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা মাপা সহজসাধ্য নয়। তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও দুরদর্শী চিন্তা-চেতনা আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। নির্লোভ, নিরহংকারী একজন আলেমেদ্বীন হিসেবে তিনি আমাদের অনুসরণীয়। জামেয়া, আনজুমান, সিলসিলা, গাউসিয়া কমিটি, সুন্নীয়ত, মসলকে আ'লা হযরতের জন্য সারাটি জীবন উৎসর্গ করে গেছেন তিনি। সর্বোপরি আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর আওলাদে রসূল শায়কে ফা'আল সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.) যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। "মুফতী সাহাব পর মাশায়িখ হযরাত হোশ হ্যাঁয়।" ফানা ফীশ শায়খ হিসেবে তাঁর বড় প্রাপ্তি এটা। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি প্রথমত আমি হুযুরের একজন নগন্য ছাত্র, সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মী। আমি তাঁর ছাত্র হলেও তিনি আমাকে মাওলানা আবদুল ওয়াজেদ বলে সম্বোধন করতেন, আমাকে খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গ ও সুহবত আমাদেরকে আলোকিত করেছে। আমি মনে করি তিনি একজন সফল আলেমেদ্বীন। আশেকে রসূল, বিখ্যাত মুফতী, জগত সেরা শায়খুল হাদীস ও ওয়ায়য। যাঁর সুললিত কণ্ঠের ওয়াযগুলো মানুষের মনে রেখাপাত করত। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হত ইশকিয়ানা শে'র, সুমধুর কণ্ঠের সে না'তগুলো আমাদের বিমোহিত করত অনায়াসে।

সুন্নীয়ত প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রথম ওফাতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কামনা করি আল্লাহ্ যেন তাঁকে জান্নাতের আ'লা মকাম নসীব করেন। আমিন, বিহুরমতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

লেখক: প্রধান ফকীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

হাত তুলে দোয়ার শরয়ী বিধান

মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনি

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যাঁর মধ্যে রয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা, ভালবাসা, সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব ও আল্লাহর অশেষ রহমতের ঝর্ণাধারা। আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। এ চাওয়ার পদ্ধতিটা ভিন্ন ধরনের হতে পারে। আর ইসলামে হাত তুলে দোয়া করার ব্যাপারে সিহাহ সিত্তাহ সহ অসংখ্য হাদিসের কিতাবে প্রমাণ রয়েছে।

যেমন একটি বিষয় হলো হাত তুলে দোয়া করা। কিছু লোকের অতি আবেগের কারণে এটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে রূপ ধারণ করেছে। অথচ এ বিষয়ের আসল সমাধান হলো হাত তুলে দোয়া করা ফরজ না হলেও, এটি কোন বিদ'আত বা নিষিদ্ধ কোন আমল নয়; বরং কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে এটি একটি সুন্নাত আমল। সুন্নাতের এ আমলকে বিদ'আত বলার কোনো অধিকার নেই। হাত তুলে দোয়া করা হাদিসের ছয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাব অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার মাধ্যমে প্রমাণিত। অন্যদিকে দোয়ার সময় হাত তোলার কথাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই, যাতে হাত তুলে দোয়া করাকে হারাম বা নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে হাত তুলে দোয়া করার নিয়ম চলে আসছে। এতে কেউ কোনো ধরনের আপত্তি করেননি। ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম শাফেয়ি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও অগণিত ফকিহ মুহাদ্দিস চলে গেছেন। কোনো একজন ইমামও এ বিষয়ে আপত্তি করেননি। শুধু ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়্যিম এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। তথাকথিত আহলে হাদিসের আলেম নাসির উদ্দীন আলবানীর অনুকরণে বর্তমানে কিছু লা-মাযহাবি আলেম হাত তুলে দোয়া সম্পর্কে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা ইসলামি শরিয়তের যুক্তিতে কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নাজদির উত্থানের আগ পর্যন্ত এবং পেট্রো ডলার পাওয়ার আগ পর্যন্ত ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোয়ার আমল জারি ছিল। এমনকি লা-মাযহাবিদের আলেমও তা সমর্থন করেছেন। যেমন সায়্যিদ নাজির হোসাইন, নাওয়াব সিদ্দিক হাসান (ভূপালি), সানাউল্লাহ, হাফেজ আব্দুল্লাহ, মাওলানা মুবারকপুরীর মতো আলেমরাও হাত তুলে দোয়া করাকে বিদ'আত বা নিষেধ বলেননি। কয়েকজন লোকের নির্বিচারে ভিন্ন মতের কারণে উম্মতের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সুন্নাত আমলকে বিদ'আত বা নিষিদ্ধ আমল বলা কখনো যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

হাদিসেপাকে দেখা যায়, দোয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন বা সময়ের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তবে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেক জায়গায় দোয়া করেছেন তা হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে। এর মধ্যে হাত তুলে দোয়া করা অন্যতম। এ বিষয়টি সমাজের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে হাদিস শরিফ, সলফে সালেহিনের আমল ও তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই লজ্জাশীল এবং সম্মানিত। বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তুলে দোয়া করে, তখন তিনি খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন"।[১১]

ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। লা-মাযহাবিদের আলেম সফিউর রহমান মোবারকপুরী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় এটিকে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই হাদিসটি বর্ণনা করে কোনো মন্তব্য করেননি। এতে বোঝা গেল, হাদিসটি নিঃসন্দেহে সহিহ।

লা-মাযহাবিদের কথিত আলেম নাসির উদ্দীন আলবানী সহিহ ইবনে মাজাহ ও দ্বয়িফ ইবনে মাজাহ নামে দুটি কিতাব লিখেছেন। এতে এই হাদিসটি সহিহ ইবনে মাজাহয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

লা-মাযহাবিদের আলেম উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদিসটিকে সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, হাদিসটি সবার কাছে সহিহ এবং নির্ভরযোগ্য।

এ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে দোয়ার সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা কোনো বিশেষ দোয়া কিংবা ইস্তেসকার

---

[১১]. আবু দাউদ।

দোয়া সম্পর্কে নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য বিধায় সকল দোয়াতেও হাত তোলা প্রযোজ্য।

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সুনানে তিরমিযিতে একটি অধ্যায় লিখেছেন " باب ما جاء فى رفع الأيدي عند الدعاء অর্থাৎ দোয়ার সময় হাত তোলা সম্পর্কীয় বর্ণনা। তিনি এ বিষয়টি নিয়ে অধ্যায় নির্ধারণ করাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, দোয়ার সময় হাত তোলা ইমাম তিরমিযি রহ. এর কাছে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এতে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় হাত উঠালে তা নামানোর আগে চেহারা মোবারকে মুছে নিতেন।[১২]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, হাদিসটি সহিহ। বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হাদিসটি হাসান।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, এ হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে দোয়ার সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, দোয়ার সময় হাত তোলা রাসুল এর সুন্নাত এবং দোয়ার শেষে হাত দিয়ে মুখমন্ডল মাসেহ করাও সুন্নাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করার সময় হাতের তালু ওপর দিকে করো। হাতের তালুর উল্টো দিক করে দোয়া করো না। যখন দোয়া করা শেষ হবে, দুই হাত দিয়ে মুখমন্ডল মাসেহ করো।[১৩]

ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত আবু দাউদ শরিফের উল্লিখিত হাদিস সম্পর্কে লা-মাযহাবি কোনো কোনো আলেম প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই হাদিসের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। সেজন্য হাদিসটি দ্বয়িফ। এ প্রশ্নের উত্তরে লা-মাযহাবিদেরই আলেম শামসুল হক আজিমাবাদী আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনুল মাবুদে' ওই হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন, ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি যে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি, সে বর্ণনাকারীর নাম ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইবনে মাজাহ শরিফে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কিতাব "তাকরিবুত তাহযিবে" ওই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। ফলে হাদিসটি দ্বয়িফ বলার কোনো সুযোগ থাকে না।

লা-মাযহাবিদের কোনো আলেমের কথা অনুযায়ী যদি ওই হাদিসটির সনদ দ্বয়িফও ধরে নেওয়া যায়, তখনো আলোচ্য বিষয়ে হাদিসটি দলিল হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ লা-মাযহাবিদের আলেম হাফেজ আব্দুল্লাহ রওপুরী তাঁর একটি ফতোয়ায় লিখেছেন, "শরিয়তের বিধান দুই প্রকারঃ এক. কোনো কিছুকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া, দুই. অবৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া।" প্রথম প্রকারের বিধানের জন্য সহিহ ও দ্বয়িফ হাদিস দুটিই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকারের জন্য শুধু সহিহ হাদিসই প্রযোজ্য।

হাত তুলে দোয়া করা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এটি একটি বৈধ কাজ, হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ নয়। তাই বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার জন্য সহিহ ও দ্বয়িফ উভয় প্রকারের হাদিসই প্রযোজ্য। এ ছাড়া তিনি তাও মেনে নিয়েছেন, হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব আমল।[১৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম ছিল, 'তিনি যখন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন, তখন নিজের হাত চেহারা মোবারকে ফেরাতেন'।[১৫] (হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে গ্রহণযোগ্য)।

হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই বর্ণনাটি বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে হাত উঠিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও ফকিহদের দীর্ঘ যাচাই-বাছাই ও আলোচনার পর হাদিসটি নির্ভরযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বুখারি শরিফের কিতাবুদ্ দা'ওয়াতে "বাবু রাফয়িল ইয়াদায়ি ফিদ দোয়া"য় হযরত আবু মুসা আশআরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, দোয়ার মধ্যে উভয় হাত এতটুকু উঠিয়েছেন, যাতে তাঁর হাতের পাতার শুভ্রভাগ দেখা গিয়েছে।

---

[১২] . জা'মে তিরমিযি ২/১৭৬, আল মুজামুল আওসাত লিতত্বাবরানি ৫/১৯৭, হাদিস: ৭০৫৩।

[১৩] . আবু দাউদ ৫৫৩, আদ্দাওয়াতুল কবির লিল বায়হাকি, পৃ. ৩৯।

[১৪] . ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদিস ১/২২-১৯৮৭ ইং।

[১৫]. আবু দাউদ ।

এ ছাড়া ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত দুটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এ তিনটি হাদিসের আলোকে বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি লেখেন, প্রথম হাদিসটি তাঁদের জবাব, যাঁরা বলেন হাত তুলে দোয়া করা শুধু ইসতিস্কার নামাজের জন্যই খাস। দ্বিতীয় হাদিস তাঁদের জবাব, যারা বলেন, ইসতিস্কার দোয়া ছাড়া অন্য কোনো দোয়ায় হাত উঠানো যাবে না।[১৬]

এ বিষয়ের সমর্থনে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ি ও হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করছি।

এরপর তিনি উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে এবং খুব পেরেশান ও মলিন বদনে আসমানের দিকে হাত তুলে দোয়া করেন, হে আল্লাহ!... তখন সে ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়।[১৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার সময় বুক পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং দোয়া শেষে হাত মোবারক চেহারায় ফেরাতেন।[১৮]

সিহাহ সিত্তার অনেক হাদিস থেকে এ কথা তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দোয়ার সময় হাত উঠিয়েছেন এবং হাত মুখে ফিরিয়েছেন।

ইমাম মুহিদ্দীন আন নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর মুহায্যাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ''আল মাজমু'' গ্রন্থে দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো এবং হাতের তালু মুখে ফেরানোর ব্যাপারে ৩০টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এর বিধান সম্পর্কে মন্তব্য করেন, দোয়ায় হাত উঠানো মুস্তাহাব।[১৯]

সব শেষে ইমাম নাওয়াভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লেখেন, যারা এসব হাদিসকে কোনো সময় বা স্থানের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে, তারা বড়ই ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

তিনি কিতাবুল আযকারে নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টি জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। এবং এর প্রমাণে তিরমিযি শরিফে বর্ণিত হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা এবং আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস উল্লেখ করেছেন।[২০]

বিষয়টি নিয়ে হযরত ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফতহুল বারি ১১/১১৮ এবং বুলুগুল মুরামে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদিস উল্লেখ করে দোয়ায় হাত উঠানো মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন। এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো, হাত তুলে দোয়া করা মুস্তাহাব।

বর্তমানে লা-মাযহাবি যারা হাত তুলে দোয়া করাকে সরাসরি বিদ'আত বলে হক্কানি ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, তাদের বিজ্ঞজনদের এ ব্যাপারে মতামত কী, দেখা যাক।

লা-মাযহাবিদের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'নাযলুল আবরার' এ স্পষ্ট লেখা আছে, দোয়াকারী দোয়ার সময় হাত উঠাবে। কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলবে। এটি হলো দোয়ার আদব। কারণ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বীকৃত।

এরপর লেখেন, যে দোয়াই হোক, যখনই হোক, চাই তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে হোক বা অন্য সময়, তাতে হাত তুলে দোয়া করা উত্তম কাজ এবং আদবের ব্যাপার।[২১]

আহলে হাদিসের আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজিতে লেখেন, নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করা জায়েজ।[২২]

মোটকথা হলো, হাত তুলে দোয়া করার বিষয়টি বিদ'আত বলা মুসলমানদের মধ্যে নতুন ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এ আহলে হাদিস নামধারিরা সরলমনা মুমিন-মুসলমানদেরকে আল্লাহর নবির সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারায় সর্বদা লিপ্ত। তাই সরলপ্রাণ মুসলমানরাও এই নব্য ফিতনা সৃষ্টিকারী আহলে হাদিস নামের ফিতনাবাজগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ আহলে হাদিস নামের ফিতনাবাজগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য সকলকে তাওফিক দান করুন, আমিন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

লেখক: সহকারী মৌলভী, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

[১৬]. ফতহুল বারি ১১/১১৯।
[১৭]. রাফউল ইয়াদাইন ১৮, সহিহ মুসলিম কিতাবুদ দোয়া ।
[১৮]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৪৭।
[১৯]. আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব ৪৪৮-৪৫০।
[২০]. কিতাবুল আজকার ২৩৫।
[২১]. নায়লুল আবরার ৩৬।
[২২]. তুহফাতুল আহওয়াজি ২/২০২, ১/২৪৪।

শ্রদ্ধার নয়নে চির অম্লান : আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী

[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

মুহাম্মদ কাসেম রেযা নঈমী

জন্ম তথ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আনোয়ারা থানা। বহুকাল ধরে অসংখ্য ওয়ালী-বুযুর্গ, সুফী-দরবেশ'র সাধনাস্থল ও তাঁদের পবিত্র পদধুলিতে ইসলামী পরিবেশ দ্বারা মুখরিত ছিলো এ অঞ্চল। তাঁদেরই একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ ওয়ালী-এ কামিল হযরত শাহ্ আসাদ আলী ফকীর (রহ.) কোন এক সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন এবং স্থানীয়দের ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন'র শিক্ষাদান করেন। তিনি নির্জনে ইবাদত বান্দেগী করতেন এবং সাপ্তাহিক জুম'আ বারে ঘোড়ায় আরোহন করে স্থানীয় একটি মসজিদে এসে জুম'আ'র নামায আদায় করতেন। পরবর্তীতে তিনি পরিবার-পরিজনকে রেখে (রিজালুল গায়ব রূপে) নিরুদ্দেশ হয়ে যান। শত চেষ্টা করেও পরিবার ও স্থানীয়দের কেউ তাঁর হদীস লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে এ মহান সাধকের যোগ্য উত্তরসূরীগণ অত্র অঞ্চলের চাঁপাতলী গ্রামে বসবাস করে আসছেন। এ মহান সাধকেরই সুযোগ্য পৌত্র আশিক-এ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমাম-এ আহ্‌ল-এ সুন্নাত আল্লামা গাযী সায়্যিদ আযীযুল হক্ব শেরে-এ বাংলা (রহ.)'র অন্যতম মুরীদ মরহুম মুন্সী নূর আহমদ আল-ক্বাদিরী ও মরহুমা ছফূরা খাতুনের ঘরে আন্তার্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী স্কলার সুন্নিয়্যাতের প্রাণ-স্পন্দন মুফতী-এ আহ্‌ল-এ সুন্নাত ক্বা'ইদ-এ আহ্‌ল-এ সুন্নাত শের-এ মিল্লাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ১৯৪৩ সনের ১১ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে মরহুমা ছফুরা খাতুন (আমার সম্মানিত দাদী) মরহুম মুন্সী নূর আহমদ আল- ক্বাদিরী (আমার সম্মানিত দাদা)-এর মামাতো বোন ছিলেন।

শৈশব কাল

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.)'র বয়স যখন প্রায় সাড়ে চার বছর পূর্ণ হলো তখন তিনি স্বীয় পিতা মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মকতবে প্রথমে পবিত্র আমপারা পাঠ সম্পন্ন করেন। এরপর পবিত্র কুরআনের নাযেরা পাঠ সমাপ্ত করেন। অত:পর তিনি একটি স্থানীয় মাদ্‌রাসায় শিশু স্তরে ভর্তি হোন। শৈশবকালে আব্বা হযরত (রহ.) পরম পাঠানুরাগী এবং অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছয় বছর বয়সেই তাঁর সম্মানিতা মাতা (আমার সম্মানিতা দাদী) মরহুমা ছফূরা খাতুনকে হারান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)।

শিক্ষা জীবন

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) যখন শিশু স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন তখন তাঁর সুযোগ্য পিতা আব্বা হযরত (রহ.) কে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন চট্টগ্রামস্থ পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করান এবং তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে পর্যায়ক্রমে ফাযিল স্তর পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাখিল, আলিম ও ফাযিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং সরকার কর্তৃক বৃত্তি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি মধ্যখানে চট্টগ্রাম পটিয়াস্থ শাহচাঁন্দ আউলিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় কিছুকাল লেখাপড়া করেন। ফাযিল শিক্ষাসনদ লাভ করে ১৯৬২ সনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গুজারাটস্থ জামেয়া গাউসিয়া নঈমীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে বিশ্ববরেণ্য আলিম হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.)'র সান্নিধ্যে প্রায় ৬ মাস পবিত্র হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর ১ম কোর্স সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সনে পুনরায় তদানীন্তনকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরাট সফর করে একই মাদ্‌রাসায় একই বিষয়ের উপর আরো ৬ মাস লেখাপড়া করে চূড়ান্ত কোর্স সমাপ্ত করেন এবং ইলম-এ হাদীস ও ইলম-এ ফিক্‌হ'র উপর বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অত:পর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.)'র হাত মোবারক থেকে শিক্ষাসনদ লাভ করে " নঈমী" উপাধীতে অভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে স্বীয় দেশে ফিরে এসে ১৯৬৫ সনে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল হাদীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোন। উল্লেখ্য, সে বছরই তাঁর

পিতা (আমার সম্মানিত দাদা) মরহুম মুন্সী নূর আহমদ আল-ক্বাদিরী ইন্তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন) পরবর্তী বছর ১৯৬৬ সনে আব্বা হযরত (রহ.) তাঁরই পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু ও ওয়াজেদিয়া মাদ্‌রাসার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লামা আতিকুল্লাহ খাঁন (রহ.) ঢাকার বখশিবাজারস্থ সরকারী মাদ্‌রাসা-ই আলিয়ায় কামিল ফিকহ্ বিভাগে ভর্তি করান। অত্র মাদ্‌রাসায় তিনি তাঁর কয়েকজন পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরুর বিশেষ সান্নিধ্য লাভে ধন্য হোন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- ১. মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস ও তৎকালীন ঢাকার 'বায়তুল মুকার্‌রাম' জাতীয় মসজিদের খতীব হযরতুল আল্লামা মুফতী সায়্যিদ আমিমুল ইহসান মুজাদ্দিদি বারাকাতী (রহ.), ২. সুদুর চীন দেশের অর্ন্তগত "কাশগার" অঞ্চল থেকে আগত আরবী সাহিত্যিক ও কবি হযরতুল আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান কাশগারী (রহ.)। এ সকল হাযরাতের বিশেষ সান্নিধ্যে থেকে আব্বা হযরত (রহ.) অত্র মাদ্‌রাসা হতে অত্যন্ত সুনামের সাথে কামিল ফিক্‌হ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অত:পর অত্র মাদ্‌রাসায় প্রায় ৬ মাস উর্দু ভাষার উপর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন

১৯৬৬ সনে আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) স্বীয় পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লামা আতিকুল্লাহ খাঁন (রহ.)'র নির্দেশে উর্দু ভাষার ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করে সুদূর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে এসে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা করেন এবং প্রায় এক বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাঠদান করেন। ইত্যবসরে তাঁর জ্ঞানের সুনাম সবত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণিত আছে, পরবর্তী বছর ১৯৬৭ সনে তাঁরই পরম শ্রদ্ধাভাজন আরেক শিক্ষাগুরু চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রথম সুযোগ্য প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লামা জনাব ওয়াকারুদ্দিন রিজভী ক্বাদিরী (রহ.) তাঁকে ইমাম-এ আহল-এ সুন্নাত আল্লামা গাযী আযীযুল হক্ব শেরে বাংলা (রহ.)'র নূরানী হাতে প্রতিষ্ঠিত হাটহাজারীস্থ আজিজিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি মুহাদ্দিস পদে দায়িত্ব লাভ করার পর পাঠদানে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উল্লেখ্য অত্র মাদ্‌রাসা সে সময়ে "কামিল হাদীস" স্তর পর্যন্ত উন্নীত ছিলো। পরবর্তী ১৯৬৮ সনে শাহানশাহ-এ সিরিকোট কুতুবুল আউলিয়া আল-এ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সায়্যিদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)'র বরকত মন্ডিত হাতে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াখ্যাত সুন্নী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'র সুযোগ্য প্রিন্সিপাল আল্লামা নসরুল্লাহ খাঁন ক্বাদিরী আফগানী (রহ.)'র বিশেষ অনুরোধে এবং গাউস-এ যামান মুরশিদ-এ বরহক্ব আল-এ রসূল হযরতুল আল্লামা হাফিয ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ তায়্যিব শাহ (রহ.)'র অন্যতম খলীফা জনাব নূর মুহাম্মদ আল-ক্বাদিরী (রহ.)'র মাধ্যমে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সিনিয়র শিক্ষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে "শায়খুল হাদীস" পদে উন্নীত হয়ে ইন্তিকাল অবধি ন্যায়-নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। তবে মধ্যখানে ১৯৮০ সনে পটিয়াস্থ শাহচাঁন্দ আউলিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় এক বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং সে বছরই তাঁর অনন্য প্রচেষ্টায় ওই মাদরাসায় কামিল হাদীসের ক্লাস চালু হয়। পরবর্তীতে স্বীয় পীর ও মুরশিদ গাউস-এ যামান আল-ই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) মুরশিদ-এ বরহক্ব আল্লামা হাফিয ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)'র নির্দেশে পুনরায় জামেয়ার খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বশেষ তিনি ২০০৮ সনে সরকারীভাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করলেও বর্তমান হুযুর ক্বিবলা মুরশিদ-এ বরহক্ব হযরতুল আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ তাহির শাহ (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, "সরকারীভাবে নঈমী সাহেব অবসর গ্রহণ করলেও হযরাত-এ কিরাম তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করেননি। তিনি আমৃত্যু জামেয়ার খিদমত করে যাবেন"। বর্তমনে শেরে মিল্লাত (রহ.)'র নূরানী দর্‌স গ্রহণে ধন্য এমন অসংখ্য শীষ্য অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, মুফাস্সির পদে থেকে বিভিন্ন খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশসহ বর্হিবিশ্বে সরকারী বেসরকারী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের তাঁর অনেক শীষ্য দেশ-দশের সেবা করে যাচ্ছেন।

দৈহিক গঠন

আব্বা হযরতে আল্লামা নঈমী (**রহ.**)'র উচ্চতা ছিলো প্রায় ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। শারীরিক গঠন মধ্যম প্রকৃতির ছিলো এবং মেদ-ভুড়ি সম্পন্ন ছিলেন না। চোখ ছিলো কালো। চেহেরা

ছিলো ফর্সা। মুখে ছিলো ঘন দাঁড়ি। তিনি দাঁড়িতে মেহেদী ব্যবহার করতেন। গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতেন। দন্ত ছিলো মধ্যম প্রকৃতির এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাঝে হালকা ফাঁক ছিলো। চেহেরা নয় লম্বা নয় গোলাকার। প্রাথমিক সময়কালে তিনি বাবরি চুলের অধিকারী ছিলেন, পরবর্তীতে চুল হালকা পাতলা হয়ে যায়। বুকের উপরিভাগে ঘন ও পিঠের উপরের দুই পাশে হালকা পশম ছিলো। পায়ের তালু ছিলো সমতল। তিনি কালো, লম্বা, শক্ত টুপি ব্যবহার করতেন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিলো জুব্বা, কাবলী, সালোয়ার।

ত্বরীক্বতের দীক্ষা গ্রহণ

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) জাহিরী ইল্‌ম (প্রকাশ্যে অর্জিত জ্ঞান) কে সুপথ প্রাপ্তির একমাত্র পাথেয় মনে করেননি। কারণ, অধিকন্তু ইলম-এ তাসাওওফ (সূফী তত্ত্ব) ও বাতিনী ইল্‌ম (মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অপ্রকাশ্য জ্ঞান) বিমুখ শুধু জাহিরী ইল্‌মের ধারক-বাহকরাই ইসলামের গুঢ়-রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়, তাই ইলম-এ তাসাওওফ ও বাতিনী ইল্‌ম'র দ্বারে উপনীত হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সঠিক সিলসিলার ত্বরীক্বত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। পূর্বসূরী সুন্নী মুসলিম মনীষীগণ এ ধারাকে মনে প্রাণে ধারণ করে দু'জাহানে সাফল্য অর্জন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সে আধ্যাত্মিক শিক্ষার্জনের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৬৮ সনে গাউস-এ যমান, মুরশিদ-এ বরহক্ব আওলাদ-এ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)'র নূরানী হাতে বায়'আত গ্রহণ করে "সিলসিলা-এ আলিয়া ক্বাদিরীয়্যাহ" ত্বরীক্বতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সে থেকে প্রতিনিয়ত ত্বরীক্বতের বহুমুখী খিদমতে নিয়োগের মাধ্যমে ইন্তিকাল অবধি স্বীয় পীর-মুরশিদ হুযুর ক্বিবলা (রহ.) ও তাঁর আওলাদগণের অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশসহ বর্হিবিশ্বে ত্বরীক্বতের প্রচারণায় নিরলস খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন আলহামদু-লিল্লাহ।

স্বীয় পীর'র সাথে আব্বা হযরত'র সম্পর্ক

গাউস-এ যামান, মুরশিদ-এ বরহক্ব আল-এ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লামা হাফিয ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র সাথে আব্বা হযরত (রহ.)'র এক প্রকার উষ্ণ সম্পর্ক ছিলো। হুযুর ক্বিবলা (রহ.) আব্বা হযরত (রহ.) কে খুব বেশী ভালোবাসতেন। আব্বা হযরতও সে ভালোবাসার যথাযথ মূল্যায়ন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে গেছেন আলহামদু-লিল্লাহ। আব্বা হযরত (রহ.) তাঁর পীর ও মুরশিদ'র শানে লেখা 'কেয়া কারে তা'রীফ-এ যাত-এ শাহে তায়্যিব কি আনাম' ক্বছীদার শেষ চরণে লিখেন- "থাম লে মুরশিদ কা দামান আয়ে নঈমী তা আবাদ, ছোড় নাহ হারগিয কাভি তূ উন কা হ্যায় আদনা গোলাম"। অকপটচিত্তে বলা যায়, ত্বরীকতে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু তিনি এই শিক্ষণীয় শেষ পঙতিযুগলের কথা তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছেন। যেখানে বর্তমানে কিছু কিছু মানুষ অর্থের লোভে নিজের ঈমান ও মাযহাব বিক্রি করে দিচ্ছে, সেখানে আব্বা হযরত (রহ.) এই ধরনের নোংরা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাঁর জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও এই বরহক্ব সিলসিলা ও স্বীয় পীর-মুরশিদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করেননি; বরং সিলসিলা ও পীর-মুরশিদ'র আদর্শ এবং আহল-এ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র আক্বীদা'র উপর অবিচল ও অটল ছিলেন এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে দ্বীন-মাযহাব ও সিলসিলার অগ্রগতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন আলহামদু-লিল্লাহ। আপন মুর্শিদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. এই ঘটনা আব্বা হযরত (রহ.) আমি অধমকে কয়েক বছর আগে বলেছিলেন- কোন এক বছর আব্বা হযরত (রহ.) গাউস-এ যমান মুরশিদ-এ বরহক্ব আল্লামা হাফিয ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.)'র জীবদ্দশায় সিরিকোট দরবার শরীফে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যাওয়ার কয়েকদিন আগে এক রাতে আব্বা হযরত স্বপ্নে দেখলেন- তিনি সিরিকোট দরবার শরীফের একটি ছোট্ট গলি বেয়ে উঠছেন উঠার পরপরই গাউস-এ যমান হুযুর তায়্যিব শাহ (রহ.)'র সাথে আব্বা হযরতের যিয়ারত হলো, আব্বা হযরত (রহ.) হুযুর ক্বিবলা (রহ.)'র সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন অত:পর হুযুর ক্বিবলা (রহ.) আব্বা হযরতের কপালে চুমু খেলেন। এ স্বপ্নের কথা আব্বা হযরত (রহ.) কাউকে বলেননি। পরবর্তীতে যথা সময়ে সিরিকোট শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সিরিকোট দরবার শরীফ পৌঁছার পর দরবারের ঠিক ঐ গলি বেয়ে আব্বা হযরত (রহ.) উঠলেন উঠার পর হুযুর ক্বিবলা'র সাথে আব্বা হযরত (রহ.)'র যিয়ারত হলো। আব্বা হযরত (রহ.) হুযুর ক্বিবলা (রহ.)'র সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন এবং ঠিক স্বপ্নের ন্যায়

হুযুর ক্বিবলা (রহ.) আব্বা হযরতের কপালে চুমু খেলেন, সুবহানাল্লাহ!!!। শুধু এইটুকুতে শেষ নয়, এরপর হুযুর ক্বিবলা (রহ.) বললেন- "ইয়ে আপ কে খাব কি তা'বির হ্যায়", অর্থ এটা আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। সুবহানাল্লাহ!!!। ২. আব্বা হযরত (রহ.) কোন এক প্রসঙ্গে মাওলানা নঈমুল হক নঈমীকে বললেন- 'নঈম! আমার বিশ্বাস, আমার উপর কোনো যাদু-টোনা বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ্। নঈমুল হক আরয করলেন- হুযুর! এর কারণ কী? আব্বা হযরত (রহ.) বললেন- কোনো এক বছর বালুয়ার দিঘির পাড়স্থ খানকাহ্ শরীফে হুযুর ক্বিবলা তৈয়ব শাহ (রহ.)'র অবস্থানকালীন আমি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, বিছানা থেকে উঠতেও পারছিলাম না। আমার পুরোপুরি এই আশঙ্কা ছিলো, আমার উপর কেউ যাদু-টোনা করেছে। পুরো পৃথিবী সাক্ষী, হুযুর ক্বিবলা (রহ.) যখন বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন আমি নিজের ব্যক্তিগত মাহফিল ও যাবতীয় ব্যস্ততা বাদ দিয়ে হুযুর ক্বিবলা (রহ.)'র খিদমতে নিয়োজিত থাকি। হুযুর ক্বিবলা খানকাহ শরীফে অবস্থানরত, কিন্তু আমি আমার অসুস্থতার কারণে হুযুরের খিদমতে যেতে পারছিনা। বিষয়টি আমাকে খুব ব্যথিত করলো। ওই অবস্থায় এক রাতে বিষন্নচিত্তে আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্নে দেখলাম, আমি বিছানায় শায়িত অবস্থায় আছি আর আমাকে এক পার্শ্ব থেকে হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.) এবং অন্য পার্শ্ব থেকে আল্লামা সায়্যিদ নূরুচ্ছাফা নঈমী (রহ.) ধরে বিছানা থেকে তুললেন। অত:পর তাঁরা উভয়ে আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যান। তখন দেখতে পেলাম, আমার সামনে হুযুর ক্বিবলা (রহ.) উপবিষ্ট। এ দুই হযরত হুযুর ক্বিবলা (রহ.) কে বললেন- "এ বাচ্চাকে আপনি গ্রহণ করুন"। হুযুর ক্বিবলা (রহ.) আমাকে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙার পর আমি নিজেকে পরিপূর্ণ সুস্থ পেলাম এবং কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। অত:পর কালবিলম্ব না করে বলুয়ার দিঘি পাড়স্থ খানকাহ শরীফে হুযুর ক্বিবলা (রহ.)'র খিদমতে চলে গেলাম। হুযুর ক্বিবলা (রহ.) আমাকে দেখে হেসে হেসে গতরাতের স্বপ্নের কথা বলে দিলেন। আল্লাহু আকবর!!! তখন থেকে আমার মনে বিশ্বাস জন্মালো, কোনো যাদু-টোনা আমার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না ইনশা-আল্লাহ।

স্বপ্নযোগে ইমাম বুখারী'র দর্শনলাভ

আব্বা হযরত (রহ.)'র শীষ্য মাওলানা নঈমুল হক নঈমী আমি অধমের কাছে বর্ণনা করেন-ইন্তিকালের কয়েকবছর আগের কথা, একদিন আব্বা হযরত পবিত্র আলমগীর খানকাহ শরীফের দু'তলায় হাঁটছিলেন, সাথে নঈমুল হকও ছিলেন আব্বা হযরত (রহ.) তাঁকে বললেন- নঈম!! সম্ভবত আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। নঈম বললেন- হুযুর আপনি এরকম কেন বলছেন? আপনি ইনশাআল্লাহ অনেকদিন বাঁচবেন। সবাই আপনার হায়াতে বরকত সাধিত হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত দো'আ করছে। আপনি আরো অনেকদিন খিদমত করবেন ইনশাআল্লাহ। আব্বা হযরত (রহ.) বললেন- আমি ইমাম বুখারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে স্বপ্নে দেখেছি। সুবহানাল্লাহ!!! কারণ বুযুর্গদের তা'বীর হলো, যে ব্যক্তি ইমাম বুখারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে স্বপ্নে দেখবে সে বেশী সময়কাল বাঁচবে না। একটু কৌতুহলবশত নঈম জিজ্ঞেস করলেন- হুযুর! ইমাম বুখারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দেখতে কেমন ছিলেন? আব্বা হযরত (রহ.) বললেন- দেখতে খুবই সুন্দর! ইমামের বুকে প্রচুর লোম ছিলো।

স্বপযোগে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দীদার লাভ

এই ঘটনা আমি অধমের কাছে মাওলানা নঈমুল হক নঈমী এই মর্মে বর্ণনা করেন- আজমীর শরীফের কোন এক সফরে আমি শেরে মিল্লাত হুযুরের সাথে ছিলাম। আমি প্রত্যক্ষ করলাম শেরে মিল্লাত হুযুর (রহ.) প্রতি রাতেই একটি ওয়াজীফা বই থেকে কিছু দো'আ পাঠ করছেন। আমি কৌতুহল বশত: হুযুরকে জিজ্ঞেস করলাম- হুযুর আপনি প্রত্যেকদিন রাতে কী ওয়াজীফা পড়েন? আব্বা হযরত (রহ.) বললেন- আমি প্রত্যেক রাতে একটি দরূদ শরীফ পাঠ করি। আর এই দরূদ শরীফ আমি অনেকদিন ধরে পাঠ করে আসছি। কোন এক রাতে (নিজ গৃহে) আমি ওই দরূদ শরীফটি পাঠ না করে ঘুমিয়ে পড়ি। সে রাতেই স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দীদার লাভ করি। সুবহানাল্লাহ!!! আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন- তুমি আজকে দরূদ শরীফ পাঠ করলে না কেন? আল্লাহু আকবর!!! আব্বা হযরত বললেন- তখন থেকে আমি প্রত্যেক রাতে নীরবচ্ছিন্নভাবে সে দরূদ পাঠ করতে থাকি।

ওয়াজের ময়দানে পদচারণা

আমার জানা মতে, আব্বা হযরত (রহ.) ফাযিল স্তরে অধ্যয়নরত অবস্থায় মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসীহত'র সূচনা করেন। তিনি ওয়াজের ময়দানে একজন খাঁটি নবী ও ওয়ালী প্রেমিক, অনলবর্ষী বক্তা, মোনাযির-এ আহ্‌ল-এ সুন্নাত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ওয়াজ ও বক্তব্যে ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'আহল-এ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র আক্বীদা ও আমল'র প্রচার ও প্রসার বিশেষত "মাসলাক্ব-এ আ'লা হযরত"-এর প্রচারে এবং ওহাবী, মাওদুদী, শিয়া, লা-মাযহাবী সম্প্রদায়সহ সকল প্রকার বাতিল মতবাদ খন্ডনে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে তিনি বেশ কয়েকবার ওয়াজের ময়দানে ওই সকল বাতিল ফিরক্বা কর্তৃক আক্রান্তও হন। ইসলাম ও সুন্নীয়্যাত প্রচার ও প্রসারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও বহির্বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মীয় কনফারেন্সে তাঁর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পবিত্র মক্কা, মদীনা-এ তায়্যিবা, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, তুরস্ক, জেরুজালেম, পাকিস্তান, ভারত, মালেশিয়া, ইরান, লন্ডন, বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার), নেপাল ইত্যাদি রাষ্ট্র সফর করে দ্বীন-মাযহাব ও ত্বরীক্বতের প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ সফর ছিলো ২০১৯ সনের যুল-হাজ্জাহ মাসে সিরিকোট দরবার শরীফে। তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ বয়ান করেন ২০২০ইং সনের ২০ মার্চ চট্টগ্রাম বোয়ালখালীর কধুরখিলস্থ তায়্যিবিয়া তাহিরিয়্যাহ সুলতান মোস্তাফা শাহী জামি' মসজিদে জুম'আ দিবসে। ওয়াজের বিষয় ছিলো- পবিত্র লাইলাতুল মি'রাজ। উল্লেখ্য তিনি উক্ত মসজিদে ইন্তিকাল অবধি প্রায় ৭ বছরের অধিক সময়কাল জুম'আর খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

'শেরে মিল্লাত' উপাধী লাভ

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) 'শেরে মিল্লাত' (ধর্মের সিংহ পুরুষ) উপাধীতে কোন্ সনে অভিষিক্ত হন তা এ মুহূর্তে আমার জানা নেই। তবে যতটুকু জানা যায়, পটিয়ার একটি সুন্নী কনফারেন্সে আব্বা হযরত (রহ.)'র দলীলসমৃদ্ধ ও হৃদয় জুড়ানো ওয়ায্ শুনে বিমুগ্ধ হয়ে মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ আমিরী নঈমী (রহ.) উপস্থিত ওলামা-এ কিরাম ও সুন্নী জনতার সম্মুখে আব্বা হযরতকে 'শেরে মিল্লাত' মর্মে ঘোষণা করলে উপস্থিত সবাই অকপটচিত্তে সে ঘোষণার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তখন থেকেই আব্বা হযরত 'শেরে মিল্লাত' উপাধীতে খ্যাতি লাভ করেন।

সাংগঠনিক অবদান

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) সাংগঠনিক বহুমুখী অবদান রেখেছিলেন। তিনি শাহান-শাহ-এ সিরিকোট (রহ.)'র নূরানী হাতে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সংগঠন আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া (ট্রাস্ট)'র অধীন ত্বরীক্বত ভিত্তিক সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র প্রচার প্রসারে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ১৯৮০ সনে গঠিত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট'র সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য। তিনি ছিলেন আহ্‌ল-এ সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (O.A.C)-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন, লন্ডন'র আজীবন সদস্য। তিনি বিগত ২০১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আহ্‌ল-এ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশে'র কেন্দ্রিয় কাউন্সিলে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়ে উক্ত পদে ইন্তিকাল অবধি ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যান। এছাড়াও তিনি আরো সাংগঠনিক বহুমুখী অবদান রেখে গিয়েছেন।

সম্মানিত ওস্তাদবৃন্দ

আমি অধম বিগত ২০/০২/২০১১ইং তারিখে আব্বা হযরত (রহ)'র কক্ষে গিয়ে আব্বা হযরত'র কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ওস্তাদগণের নাম জানতে চাইলাম, আব্বা হযরত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কয়েকজন উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন। তখন আমি সাথে সাথে সে নামগুলো নথিভুক্ত করি। তাঁরা হলেন- ১. হাক্বীমুল উম্মাত হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.), গুজরাট, পাকিস্তান, ২. মুফতী-এ আযম পাকিস্তান হযরতুল আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকারুদ্দীন ক্বাদিরী রিজভী (রহ.), করাচী, পাকিস্তান, ৩. খতীব-এ বায়তুল মোকর্‌রাম মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী (রহ.), বিহার, ভারত, ৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আতীকুল্লাহ (রহ.), চট্টগ্রাম, ৫. ইমাম-এ আহ্‌লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশিমী (রহ.), চট্টগ্রাম, ৬. শায়খুল আদাব হযরতুল আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগারী (রহ.), কাশগার, চীন, ৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুর রহমান (রহ.), (আনোয়ারা, চট্টগ্রাম), ৮. হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ শাহ্‌জাহান (রহ.), (ভারত), ৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস

সাত্তার (রহ.), বিহার, ভারত, ১০. মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ মূসা মুজাদ্দিদী (রহ.), পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১১. মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ফোরক্বানী (রহ.), ১২. মুফতী রশীদ আহমদ (রহ.), চট্টগ্রাম। ১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালিক (রহ.) এবং ১৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াজিহুল্লাহ (রহ.), নোয়াখালী।

উপরোক্ত তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদগণের মধ্যে হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.), মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী বারাকাতী (রহ.), হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান (রহ.), হযরতুল আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগারী (রহ.), ইমামে আহল-এ সুন্নাত আল্লামা হাশেমী (রহ.) প্রমুখ ওস্তাদগণের পাঠদান আব্বা হযরত (রহ.) কে খুব বেশী বিমুগ্ধ করে। বিশেষত হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.)'র ব্যাপারে আব্বা হযরত (রহ.) বলেন- তিনি (হাকীমুল উম্মাত) যখন পবিত্র কুর'আন ও হাদীস শরীফ পাঠদান করতেন তখন তিনি সহজ সরল সাবলীল ভাষায় সে পাঠবিষয় বুঝিয়ে দিতেন এবং পবিত্র কুর'আন'র এক একটি আয়াত ও পবিত্র হাদীস চার পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দিতেন। পদ্ধতিগুলো হলো- ১. আলিমানা (জ্ঞানমূলক), ২. মুহাক্কিক্বানা (বিশ্লেষণধর্মী), ৩. আশেকানা (প্রেমাবেগপূর্ণ), ৪. সূফীয়ানা (সূফীতত্ত্ব ধারা)। আব্বা হযরত (রহ.) তাঁর ওয়াজ-নসীহত, পাঠদানে সে ধারাগুলোকে প্রায়শঃ অনুসরণ করতেন।

গ্রন্থ রচনা

আব্বা হযরত আল্লামা নঈমী (রহ.) শত ব্যস্ততার মাঝেও সুযোগ পেলে লেখা-লেখি করতেন। আহ্‌ল-এ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র প্রকাশনায় উর্দু ভাষায় তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি "দালাইলুল ক্বিয়াম লি-মীলাদি খায়রিল আনাম" (দালা'ইলুন নঈমিয়্যাহ) এখনো সর্বস্তরের জ্ঞান পিপাসু ও পাঠক মহলের মাঝে সমাদৃত হয়ে আছে। তিনি উক্ত বইয়ে প্রামাণ্য তথ্যালোকে তাজেদার-এ মদীনা সরওয়ার-এ কা'ইনাত রসূল আকরাম নূর-এ মুজাস্‌সাম হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র মীলাদ (জন্মালোচনা) এবং ক্বিয়াম (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সম্মানে দাঁড়ানো) বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন এবং মীলাদ-কিয়াম বিরোধীদের দাঁত-ভাঙা জবাব দিয়েছেন। বইটি ৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। পরবর্তীতে বিভিন্ন মহলের শুভাকাঙ্ক্ষিদের অনুরোধে এবং সময়ের দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আব্বা হযরতের অন্যতম যোগ্য শীষ্য বিশিষ্ট আলিম-এ দ্বীন ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুজাহিদ-এ মিল্লাত মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন (মু.জি.আ.) ২০০০ সনে বইটির বাংলা অনুবাদ রচনাপূর্বক প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহ বখতিয়ার হুযুরের এই খিদমতকে ক্বুবূল করুন এবং তাঁকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন আমীন। এছাড়াও বহুবিদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষত: আক্বীদাহ বিষয়ক মাস'আলার উপর আব্বা হযরত (রহ.)'র লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ মাসিক তরজুমান এ আহলে সুন্নাতসহ দেশে-বিদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আব্বা হযরত (রহ.)'র এ অসামান্য খিদমতকে ক্বুবূল করুন। আমীন।

ওফাত

আব্বা হযরত শেরে মিল্লাত আলহাজ্ব মুফতী মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) ১৪৪১ হিজরী সনের ১৪ যুল-ক্বা'দা, ৬ জুলাই, ২০২০ ইং রোজ সোমবার বেলা আনুমানিক ৪:৪৫ ঘটিকায় ৭৮ মতান্তরে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। আমার মুরশিদ-এ কারীম গাউস-এ যামান হযরতুল আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ তাহির শাহ (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী) আব্বা হযরত (রহ.)'র ইন্তিকালের খবর শুনে বলেন- "নঈমী সাহাব পর হাযরাত খোশ হ্যাঁয়"। অর্থ : নঈমী সাহেবের উপর (সিলসিলার) হযরতগণ সন্তুষ্ট। আলহামদু-লিল্লাহ!!!। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব রসূল-এ আকরাম জান-এ দো-আলাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ওয়াসীলায় এবং হুযুর ক্বিবলা (মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)'র নূরানী যাবানে উক্ত সাক্ষ্যের সাদক্বায় আব্বা হযরত (রহ.) কে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন, আর আমাদের সবাইকে আব্বা হযরতসহ হাযরাত-এ কেরাম'র পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা ফাযিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

কিতাব অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়

যুগের চাহিদা পূরণে আন্‌জুমান প্রকাশনার অবদান

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিগুলোর ইতিহাস চর্চা করলে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট হয় যে, 'ইল্‌ম' (জ্ঞান)-ই পূর্ববর্তী ও বর্তমান জাতিসমূহ ও সম্প্রদায়গুলোর উন্নতি ও মহত্ব অর্জনের মূলভিত্তি। 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) ও 'আলিম' (জ্ঞানী)'র ফযিলত ও মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত-এর নিকট এ বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট হয়-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'এবং স্মরণ করুন! যখন আপনার রব ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী।'[২৩]

অর্থাৎ 'আবুল বশর' হযরত আদম আলায়হিস সালামকে সৃষ্টি করলেন এবং 'ইলম' (জ্ঞান) দান করলেন; অতঃপর ফিরিশতাদেরকে সাজ্‌দাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং 'ইল্‌ম'-এর মর্যাদার কারণে ফিরিশতাকুল তাঁকে সাজ্‌দাহ্ করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃত ইল্‌ম কোথা থেকে আসে, যা 'ইন্‌সান' তথা মানুষের উন্নতি, সমৃদ্ধি, সফলতা ও হিদায়তের মহান মাধ্যম হয়?

প্রকৃত ইল্‌ম-এর বুনিয়াদী উৎস হচ্ছে, 'কিতাব-ই মুবীন' অর্থাৎ ক্বোরআনুল কারীম। 'কিতাব-ই মুবীন'-এর অধ্যয়ন ও চর্চা মানুষকে হিদায়ত ও সমৃদ্ধির পথে নির্দেশনা দেয়। ইরশাদ-ই বারী তা'আলা-

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'(এটি) সে-ই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব (ক্বোরআন) কোন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়। তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীরুদের জন্য।'[২৪]

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পথহারা ও গোমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথপ্রদর্শন করার জন্য স্বীয় পরম সম্মানিত বান্দাগণ তথা আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদেরকে সহীফাসমূহ ও কিতাবাদি দান করেছেন, যাতে লোকেরা ওই সহীফা ও কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে 'হাক্বীক্বী' (প্রকৃত) ইল্‌ম হাসিল করতে পারে।

কিতাব অধ্যয়নের গুরুত্ব মুসলমানগণের নিকট একটি স্বীকৃত বিষয়, যা অস্বীকার করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা 'ইলাহী সম্বোধন'-এর সর্বপ্রথম শব্দ-ই হচ্ছে, **اقْرَأْ** 'পড়ুন'।[২৫] এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ জাল্লা মাজ্‌দুহু স্বীয় 'খাতিমুন্ নাবিয়্যীন ওয়াল মুরসালীন' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়ত ও রিসালাত'র সূচনা করেছেন। আর এটিই সর্বপ্রথম হুকুম, যা আল্লাহ তা'আলা নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করেছেন।

দুনিয়ার বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-উপাত্ত, রহস্যাদি ও জ্ঞানপূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিত যদি আমরা কোন স্থান থেকে সহজে পেতে চাই, তাহলে সেটা হচ্ছে- **কিতাব**। এটি এ কারণে যে, ইলম ও হিকমত (প্রজ্ঞা) কে কিতাব রূপে একত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম হাকেম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেন, **হুযূর করীম** সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ 'তোমরা ইল্‌মকে কিতাবে লিপিবদ্ধ করো।'[২৬] এর উপরে ভিত্তি করে ওলামা-ই দ্বীন ও চিন্তাবিদগণ কিতাবকে ভান্ডার ও খনি বলে আখ্যা দিতেন।

* হাফিয ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وإذا رأيت كتابًا لم أره، فكأني وقعت على كنز

'যদি আমি কোন (নতুন) কিতাব দেখি, যা ইতিপূর্বে আমি দেখি নি, তাহলে আমি যেন খনি হাসিল করলাম।'[২৭]

কিতাব পাঠককে নিজ যুগের গ্রন্থ প্রণেতাবৃন্দের চিন্তা ও দর্শন এবং সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে অবগতি দেয়। আর সেগুলোর চাহিদাদি পূরণের জন্য নূতন প্রজন্মের দৃঢ় অবস্থান তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেখানে পাঠক কিতাবের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থাদি সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে, সেখানে কিছু কিতাব তাকে প্রাচীন যুগের

[২৩] আল্ ক্বোরআন, সূরা (২) বাক্বারা, আয়াত: ৩০

[২৪] প্রাগুক্ত, আয়াত: ২, তরজমা: কানযুল ঈমান

[২৫] আল্ ক্বোরআন, সূরা (৯৬) আল্ 'আলাক্ব, আয়াত: ১

[২৬] হাকেম, আল্ মুস্‌তাদরাক, খ-- ১, পৃ. ১৮৮, হাদিস নং- ৩৬২

[২৭] আ-রা-উ ইবনুল জাওযী (آراء ابن الجوزي), খ-- ১, পৃ. ৪৮৪,

বিখ্যাত ইমামগণ, মুহাদ্দিসীন, দার্শনিকবৃন্দ, বিজ্ঞানীগণ এবং চিন্তাবিদগণ থেকেও উপকৃত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ বর্তমান যুগে অবস্থান করে যদি কেউ প্রাচীন যুগ পর্যন্ত পৌঁছা বা নৈপুন্য অর্জন করতে চায়, তাহলে তার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে- কিতাব।

* হাফিয ইবনে জাওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

"লোকেরা যতটুকু ইলম পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কিতাবসমূহের মধ্যে পায়, এতটুকু স্বীয় ওস্তাদগণ ও মাশা-ইখের নিকট থেকে অর্জন করতে পারবে না।"

❖ আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কিতাব অধ্যয়ন করাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। এমনও বহু প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, কিতাবসমূহে বুৎপত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকেও কবূল করে নিতেন। তেমনিভাবে মেয়ের যৌতুক হিসেবে 'কুতুবখানা' (লাইব্রেরী)'রও দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহ্ওয়ায়হ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত সুলায়মান ইবনে আবদুল্লাহ যাগান্দানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মেয়েকে শাদী এ কারণে-ই করেছিলেন যে, যাতে এর দ্বারা তিনি ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র গ্রন্থভান্ডারে ভরপুর 'কুতুবখানা' পেয়ে যান।' [২৮]

❖ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, যিনি ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অনেক বড় 'শাগরেদ' (শিষ্য)। তাঁর জীবন চরিত অধ্যয়ন করে একজন ইংরেজ বলেছিল, মুসলমানদের ছোট মুহাম্মদের এ অবস্থা হলে, বড় মুহাম্মদের কী অবস্থা হবে?

ইমাম মুহাম্মদের অধ্যয়নের জগত এমন ছিল যে, তিনি পুরো রাত ব্যাপি কিতাব অধ্যয়নে জেগে থাকতেন। যখন লোকেরা তাঁকে এ কষ্ট ও প্রচেষ্টার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি বলেন, 'আমি কীভাবে নিদ্রা যাব! অথচ সাধারণ মুসলমানেরা এ কারণে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যায় যে, যখন তাদের নিকট কোন মাসআলা উপস্থিত হবে, তখন সেটার উত্তর মুহাম্মদ ইবনে হাসানের নিকট পেয়ে যাবেন।' অর্থাৎ তাঁর উম্মত-ই মুসলিমা'র মাসা-ইলগুলোর এতবেশি চিন্তা থাকত যে, সারারাত কিতাবসমূহে তাদের মাসা-ইলের সমাধান অন্বেষণ করা ও খোঁজাখুজিতে অতিবাহিত করে দিতেন, কেননা তাঁর এ ধারনা ছিল যে, লোকেরা তাঁর উপর ভরসা করে নিদ্রা যান।

❖ কিতাব অধ্যয়ন করার দ্বারা স্মৃতিশক্তি সুদৃঢ় হয়। যেমনিভাবে ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র নিকট স্মৃতিশক্তির ঔষধ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি এরশাদ করেন:

لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَعُ لِلْحِفْظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ، وَ مُدَاوَمَةِ النَّظَرِ

'স্মৃতিশক্তির জন্য লোকের প্রবল ইচ্ছা, স্থায়ী দৃষ্টি ও অধ্যয়নের চেয়ে উত্তম কোন বস্তু আমার অবগতিতে নেই।' ভাল কিতাবাদির অধ্যয়ন না শুধু মানুষের মেধা ও অনুভূতিকে চমকিত করে, বরং মানুষকে ভদ্রও করে তোলে। উন্নত গ্রন্থাবলি মানব ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও মহত্ব এনে দেয়। কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব মানুষকে অনুভূতির নতুন নতুন পর্যায়গুলোতে পথনির্দেশ করে থাকে। মোটকথা, কিতাব মানুষের উত্তম সাথী ও বন্ধু।

❖ আব্বাসী আমলের প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বী'র কবিতাতেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তিনি লিখেন এভাবে-

أَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ
وَ خَيْرُ جَلِيْسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ

'একজন মুসাফিরের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম স্থান হচ্ছে ঘোড়ার পিঠ এবং যুগের সর্বোত্তম সাথী হচ্ছে 'কিতাব'।'

❖ আরাস্তাতালিসকে (এ্যারিস্টোটল) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কোন ব্যক্তিকে জানার জন্য কী মানদন্ড ব্যবহার করেন? তিনি বললেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কতগুলো কিতাব পড়েছো এবং কী কী পড়েছো?

❖ বিখ্যাত সর্বজন স্বীকৃত চিন্তাবিদ, প্রাজ্ঞ, দার্শনিক আবূ নসর ফারাবী, যাঁকে ইতিহাসে 'মু'আল্লিম-ই সানী' (দ্বিতীয় শিক্ষক) নামে জানা যায়। মুসলিম দুনিয়ার এতবড় বিজ্ঞানী দুনিয়ার ৭০ টি ভাষা জানতেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন খুবই দারিদ্রের মধ্যে কেটে ছিল, কিন্তু এত বড় মর্যাদা তাঁর কিতাবের সাথে সংশিষ্টতা স্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। বলা হয় যে, আবূ নসর ফারাবী'র দারিদ্রের অবস্থা এমন ছিল যে, তার

---

[২৮] আল্ আনসাব লিস সুম'আনী, খ--৬, পৃ. ৩০৭

মূল ইবারত: **تزوج إسحاق بن راهويه بابنته بسبب كتب الشافعيّ حتى حصلت عنده،**

নিকট চেরাগের তেল ক্রয় করার জন্য পয়সাও ছিল না। সুতরাং তিনি রাতের চৌকিদারদের বাতির পাশে দাঁড়িয়ে কিতাব অধ্যয়ন করতেন।

❖ ইমাম জুরজানী লিখেন-

ما تطعمت لذة العيش حتى
صرت فى وحدتى للكتاب جليسًا

'আমি জীবনের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত আস্বাদন করি নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি কিতাবকে স্বীয় নির্জনতার সাথী বানিয়েছি।'

ليس عندى شيئ أجل من
العلم فلا ابتغى سواه أنيسًا

'আমার নিকট ইলম-এর চেয়ে সর্বাধিক উত্তম কোন বস্তু নেই, না আমি সেটা ছাড়া অপর কোন বন্ধু-সাথী অন্বেষণ করি।'

❖ কবি আহমদ শাওক্বী বলেন,

أنا من بدَّل بالكتاب الصحابا
لم أجد لى وافيًا إلا الكتابا

'আমি ওই ব্যক্তি, যে সাথীদের পরিবর্তে কিতাবগুলোকে আপন করে নিয়েছি এবং আমি নিজের জন্য কিতাবের চেয়ে অধিক 'ওফাদার' (বিশ্বস্ত) কাউকে পাই নি।'

❖ খলীফা মামূনের সময়ে এক উঁচুমানের সাহিত্যিক এত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন যে, তাকে বলা হলো-

سنعطيك ثمن هذا الكتاب ما يساوى وزنه ذهبًا

'আমরা আপনাকে এ কিতাবের ওজন সমপরিমাণ মূল্য হিসেবে স্বর্ণ দেব।' তখন সাহিত্যিক উত্তরে বলেন:

هذا كتاب لو يباع بوزنه
ذهبًا لكان البائع المغبونا

'যদি এ কিতাব স্বর্ণের ওজন সমপরিমাণে বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা ধোঁকার শিকার হিসেবে আখ্যায়িত হবে।'

أما من الخسران أنك آخذ
ذهبًا و تترك جوهرًا مكنونًا

'আমি কী ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্য থেকে হব না যে, আপনি স্বর্ণ গ্রহণকারী হবেন আর 'জাওহার' (মূল্যবান মণিমুক্তা) দূরে গোপনে ত্যাগ করবেন।'

❖ প্রাচীন রোম সাহিত্যিক ও দার্শনিক ফের্দিন দ্য সোস্যুর বলেন- **بيت من غير كتب كجسم من غير روح** 'কিতাবাদি ছাড়া গৃহ তেমন যেন রূহবিহিন শরীর।'

❖ একজন কবি খুবই চমৎকার বলেছেন-

سرور علم ہے کیفِ شراب سے بہتر
کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر

'জ্ঞানের আনন্দ শরাবে মত্ত হওয়া থেকে উত্তম, কিতাবের চেয়ে উত্তম বন্ধু আর কেউ নেই।'

*****

যুগের চাহিদা পূরণে আন্‌জুমান প্রকাশনার অবদান

ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও বিশ্বাস 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত'-এর প্রচার-প্রসার, মায্‌হাব্ ও মিল্লাতের কর্মকান্ড পরিচালনার্থে রাহনুমা-ই শরীয়ত ও ত্বরীকত, ক্বুতবুল আউলিয়া, বানীয়ে জামেয়া, আলে রসূল হুযূর হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৯২৫ সালে 'আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ শুধু বাংলাদেশে নয়, বরং সারা বিশ্বে সুন্নী মুসলমানদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য দ্বীনি কল্যাণ ট্রাস্ট হিসেবে স্বীকৃত। সূচনাকাল থেকেই এ ট্রাস্ট ইসলামের মূলধারা সুন্নী মতাদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বংশধারার বরকতময় হাতের 'ফয়য' (কল্যাণধারা) লাভে ধন্য হয়ে দেশব্যাপী শতাধিক দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি যুগের চাহিদা পূরণে সুন্নী আক্বীদাভিত্তিক নানা বই-পুস্তক, কিতাব প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি-

❖ তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত

হুযূর ক্বিবলা শাহান্‌শাহে সিরিকোট রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সুযোগ্য উত্তরসূরী ও খলীফা গাউসে যামান, পীরে কামিল, রাহনুমা-ই শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সদয় নির্দেশে ১৯৭৮ সালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত ও সিল্‌সিলার প্রচার প্রসারে 'মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত' প্রকাশনার শুভ সূচনা হয়। সুন্নী দুনিয়ায় এটি হুযূর ক্বিবলার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বাতেল ও ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মোকাবেলায় 'তরজুমান' অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। হুযূর ক্বিবলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

আনহু এ বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে এরশাদ করেন: 'তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত, যা মূলত মাসলাক ও সুন্নীয়তের মুখপত্র। গঠনমূলকভাবে এটাকে সজ্জিত করতে হবে, যাতে স্বাধীনভাবে মসলকের একমাত্র মুখপত্র হিসেবে প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের পথের দিশা হয়ে প্রকাশ লাভ করে।'[২৯] হুযূরের এ নির্দেশ যথার্থরূপে পালনের নিমিত্তে 'আন্‌জুমান ট্রাস্ট' পৃথকভাবে একটি 'মাসিক তরজুমান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ ও প্রতিথযশা প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও গ্রন্থপ্রণেতাবৃন্দের নিকট থেকে তথ্যনির্ভর লেখা সংগ্রহ ও সঠিকভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে এটি পাঠক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হুযূর ক্বিবলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো এরশাদ করেন: یہ ترجمان باطل فرقوں کے لئے موت ہے 'এ তরজুমান বাতিল ফির্ক্বাসমূহের জন্য মৃত্যু স্বরূপ।'[৩০]

হুযূর ক্বিবলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এ বাণীর যথার্থতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

❖ মাজমু'আহ্-ই সালাওয়াতে রসূল (ﷺ)

হুযূর ক্বিবলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সদয় নির্দেশে খাজায়ে খাজেগান, খলীফায়ে শাহে জীলান, মা'আরেফে রব্বানীর ধারক, লদুনী ইল্‌মের বাহক, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র রচিত বিশ্বে দুরূদ শরীফের ৩০ পারা সম্বলিত বিরল ও বিশাল গ্রন্থ 'মাজমু'আহ্-ই সালাওয়াতে রসূল'র নতুন সংস্করণ প্রকাশ হয়, পাকিস্তানের দক্ষ আলিম দ্বারা সেটার উর্দু অনুবাদের সূচনা করেন তিনি। যা বর্তমানে তিন খন্ডে আন্‌জুমান প্রকাশ করে যাচ্ছে। সেটা সরল বাংলায় অনুবাদ করারও সঠিক দিক নির্দেশনা দেন ও দো'আ করে যান। আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান হুযূর ক্বিবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী'র নির্দেশ ও দো'আয় 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার'-এর মহাপরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, বিশিষ্ট ওলামা-ই কিরাম এবং আমি অধম বান্দা (প্রাবন্ধিক) এ মহান খিদমতে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। ফলশ্রুতিতে সেটার বঙ্গানুবাদ এখন সমাপ্তির পথে এবং এ পর্যন্ত **ষোল পারার** উচ্চারণসহ বঙ্গানুবাদ অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। বাকী অনূদিত পারাগুলো শীঘ্রই পাঠকের হাতে পৌঁছে যাবে, ইন্ শা আল্লাহ। তাছাড়া 'আওরাদ-ই কাদেরিয়া-ই রহমানিয়া' অত্যন্ত উপকারী ও বরকতমন্ডিত কিতাবও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

❖ আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

হুযূর ক্বিবলা পীরে বাঙ্গাল রওনক্বে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী সময়োপযোগী রিসার্চ বা গবেষণা ও প্রকাশনার নিমিত্তে একটি যথোপযুক্ত 'রিসার্চ সেন্টার' (গবেষণা কেন্দ্র) স্থাপন ও সেটার যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থাপনার জন্য সদয় নির্দেশ দেন। আন্‌জুমান কর্তৃপক্ষ মহান মুর্শিদের অমীয় বাণী ও নির্দেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কোন কালক্ষেপন না করে আলম্‌গীর খানক্বাহ্ শরীফের ২য় তলায় 'রিসার্চ সেন্টার'-এর অফিস ও এর পাশে একটি 'প্রশিক্ষণ অডিটোরিয়াম' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২১ জানুয়ারী ২০১৫ ইংরেজি তারিখে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, প্রাণাধিক প্রিয় মুর্শিদে বরহক, বর্তমান হুযূর ক্বিবলা আলম বরদারে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব দামাত বরকাতুহুমুল 'আলিয়া নিজ বরকতময় হাতে উক্ত অফিস উদ্বোধন করেছেন; আর উক্ত উদ্বোধনকালে হুযূর ক্বেবলার সুযোগ্য সাহেবজাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ক্বাসেম শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলীসহ আনজুমান ট্রাস্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন; যা আন্‌জুমান'র যুগান্তকারী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার' এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত অতি জরুরী গ্রন্থ-পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছে। আক্বীদা, ঈমান, আমল, ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান, তাফসীর, হাদিস সংকলন, ফিক্‌হ, ফাত্‌ওয়া ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর এ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীতে অব্যাহত রয়েছে। এসব একান্ত জরুরী প্রকাশনার মধ্যে 'গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব', 'হুযূর ক্বিবলার নূরানী তাক্বরীর', 'ওযীফা-ই গাউসিয়া' এবং 'শানে রিসালত', 'আদ্-দা'ওয়াত' (দাওয়াত-ই খায়র বিষয়ক ম্যাগাজিন), সমসাময়িক জটিল সমস্যার শরঈ সমাধান 'যুগজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

[২৯] মাকতূব-০১, সূত্র: আল্লামা হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবনী গ্রন্থ, পৃ. ১৩৫

[৩০] প্রাগুক্ত, মালফূযাত, পৃ. ১৫৮

❖ ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া

পৃথিবীব্যাপি বিস্তৃত কম্পিউটারের সর্ববৃহৎ নেটওয়ার্ক (Network) হচ্ছে ইন্টারনেট। এটি এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তথ্যভান্ডার, অন্যতম জ্ঞানের উৎস ও যোগাযোগের সহজ মাধ্যমও বটে। আর এই সুবিশাল তথ্যভান্ডারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ওয়েবসাইট। সুখের বিষয় যে, তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে সকলের নিকট ইসলামের মূলধারা সুন্নী মতাদর্শের যাবতীয় তথ্য অতি সহজে পৌঁছে দিতে 'আনজুমান ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেছে নিজস্ব ওয়েবসাইট www.anjumantrust.org। সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘন্টা এ ওয়েবসাইট নিরবে তার সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সাইটের ভিজিটর সংখ্যা ২৮ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এখানে 'মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক রচনাসমগ্র, বিভিন্ন সেমিনারের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও ফিক্হ-ফাতওয়া'র যাবতীয় প্রশ্নাবলির উত্তর অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা আছে। ই-বুক, পিডিএফ ফরমেট-এ তৈরীকৃত গ্রন্থাবলি অতি সহজে ডাউনলোড করে অধ্যয়ন করার সুবর্ণসুযোগ রাখা হয়েছে, আর এ সেবা বিনামূল্যে-ই প্রদান করে আসছে 'আনজুমান ট্রাস্ট'। এ ওয়েবসাইট পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন মানুষ যেকোন সময় দেখতে পায়। সোশ্যাল মিডিয়া (www.facebook.com/MonthlyTarjuman), ই-মেইল (info@anjumantrust.org) ও প্রয়োজনীয় ওয়েব অ্যাপলিকেশন'র মাধ্যমেও এ তথ্যভান্ডারের উপকার আজ সকলে গ্রহণ করতে পারছে, যা বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণে ব্যাপক কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

❖ অমর একুশে গ্রন্থমেলায় 'তরজুমান প্রকাশনী'

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ বাংলা ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের যে বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই প্রতিবছর এ মাসে আয়োজিত হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রাণালয় এ মেলা নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। যুগের চাহিদা পূরণে জাতীয় গ্রন্থমেলায় দেশি-বিদেশী লেখক, গবেষক ও প্রকাশকের সাথে 'আন্জুমান প্রকাশনা বিভাগ' দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলি নিয়ে গত দু'বছর ধরে অংশ নিচ্ছে। যা সময়ের দাবি সফলতার সাথে পূর্ণ করেছে। ২০২০ সালে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়াম জিমনেশিয়াম চত্বরে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়োজিত 'অমর একুশে বইমেলা-২০২০ এ প্রথম অংশ নেয় 'আন্জুমান প্রকাশন'। এতে পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জেগে ওঠে। বইপ্রেমিকদের আগমণে মুখরিত হয় এ প্রকাশনের বুকস্টল। পাঠকরা স্বীয় আগ্রহ-উদ্দিপনা ও চাহিদা, পরামর্শ ব্যক্ত করেন কর্তৃপক্ষের কাছে। যা দেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী সংস্থা 'আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর নেতৃবৃন্দ ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অন্তরে ব্যাপক প্রেরণা যোগায়। ফলশ্রুতিতে এবারের জাতীয় গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১' এ 'তরজুমান প্রকাশনী' স্টল নং # ৭৩১ রূপে অংশ নেয় 'আন্জুমান প্রকাশনা বিভাগ'। ঢাকা রাজধানীসহ সারা দেশের বইপ্রিয় সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে গেছে ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত'-এর পয়গাম। ব্যাপকহারে বই বিক্রি, দর্শনার্থীর আগমন ও প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও প্রকাশকের পরিদর্শন- সবকিছু মিলিয়ে এক ব্যতিক্রমী পরিবেশ তৈরী হয়েছিল 'তরজুমান প্রকাশনী'তে। দেশ-বিদেশের গণমাধ্যমগুলো ও বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আনজুমান প্রকাশনাকে তুলে ধরা হয়। মেলা আয়োজকরাও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন 'আন্জুমান ট্রাস্ট'-এর। 'তরজুমান প্রকাশনী'র দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ পাঠক, দর্শনার্থী, আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করেছেন। আর সেগুলো বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই যথার্থ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ইন্ শা আল্লাহ, শীঘ্রই তা পরিপূর্ণ সফল হবে।

মানুষের আলোকিত জীবনের উপকরণ হচ্ছে কিতাব। মানবজীবন নিতান্তই একঘেয়ে দুঃখ-কষ্টে ভরা, কিন্তু মানুষ কিতাব পড়তে বসলেই সেসব ভুলে যায়। বর্তমান যুগে আধুনিক গবেষনায় কিতাব (গ্রন্থ-পুস্তক) অধ্যয়নের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের রোগ-ব্যাধি থেকে সুরক্ষা দেয় এবং দুশ্চিন্তা হ্রাস করে। ভালো কিতাবসমূহ জীবনের উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য মানবিক স্বভাবে নম্রতা সৃষ্টি করে; মস্তিষ্কে আনন্দ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রভাব ফেলে; অধ্যয়নের দ্বারা মানুষের ভেতরে ইতিবাচক ও দৃঢ় চিন্তা-বিশ্বাস তৈরী হয়; কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে মানুষের মধ্যে প্রমাণ সহকারে কথা বলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়; আজ আমরা শোনা কথায় মনযোগ না দিয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণের প্রবনতা সৃষ্টি করলে, বহু সমস্যা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিরাপত্তা পেতে পারি। যদি মুসলিম মিল্লাত দুনিয়াতে পুনরায় সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করতে চায়, তাহলে আমাদের উচিত যে, ইলম-এর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার চিন্তা করা। কেননা ইলমের সোপানের উপর দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহন করা না শুধু কঠিন, বরং অসম্ভব কাজ।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেনঃ অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ আদনান মেহরাব**
উত্তর গোবিন্দরখীল, পটিয়া,
চট্টগ্রাম

❓ **প্রশ্নঃ আমি এশার নামায আদায় করে একটি মাহফিলে অংশ গ্রহণ করি। কিছুক্ষণ পর মাহফিলে এশার নামায শুরু হয়। এমতাবস্থায় আমি বাধ্য হয়ে জামাতে এশার ফরয নামায আদায় করি। অন্য নামায নফল নিয়ত করে পড়লাম এখন আমার নামাযের কি অবস্থা হল? জানালে ভাল হয়।**

📖 **উত্তরঃ** কেউ ফরজ পড়ে নিয়েছে এবং পরে মসজিদে বা কোন মজলিশে জমাআত হতে দেখলে তখন যোহর ও এশার জামাআত নফলের নিয়্যতে উক্ত জামাতে শরীক হবে। যদি ২য় বার ফরযের নিয়্যতে শামিল হয়ে যায় তবুও তা নফল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা ফরয আদায় হয়ে গেছে। আর যোহর ও এশার ফরয আদায়ের পর জামাতে নামায কায়েম হতে দেখলে তাতে শরিক না হয়ে ইকামত শুনে বের হয়ে গেলে অথবা বসে থাকলে তখন জামাত তরককারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তা মাকরূহ হবে কিন্তু একবার আদায়ের পর ফজর, আসর ও মাগরিবের জামাত অনুষ্ঠিত হতে দেখলে শামিল হবে না। কেননা প্রথমতঃ ফজর ও আসরের ফরজ নামায আদায়ের পর নফল পড়া জায়েয নেই। দ্বিতীয়তঃ মাগরিবের জামাতে যদি নফলের নিয়্যতে শামিল হয় তখন চতুর্থ রাকআত মিলাতে হবে যা ইমামের অনুসরণের বিপরীত। এতে নামায মাকরূহ হবে বিধায় মাগরিবের ফরয আদায়ের পর জামাতে শামিল হবে না। আর জামাত চলা অবস্থায় মসজিদে বা জামাতস্থলে বসে থাকা মাকরূহ বিধায় ফজর-আসর ও মাগরিবের জামাতের সময় জামাআত স্থল ত্যাগ করবে বা মসজিদ হতে বের হয়ে যাবে।

[ফাতাওয়া-ই রজভীয়্যাহ্, ৩য় খন্ড, ৩৮৩ ও ৬১৩ পৃ. ও মুমিন কি নামায, ১২তম অধ্যায়]

❓ **প্রশ্নঃ বিভিন্ন সময় মাঠে কাজ করতে হয় বিধায় অনেক সময় গায়ে গেঞ্জিও থাকে না এ অবস্থায় নামায আদায় করলে নামায হবে কিনা? একইভাবে ঘরেও গেঞ্জি পড়ে নামায পড়া যাবে কিনা?**

📖 **উত্তরঃ** হাফ হাত বিশিষ্ট জামা-কাপড় বা গেঞ্জি পরিধান করে নামায আদায় খেলাফে আওলা ও অপছন্দনীয়, তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। আর পূর্ণহাত বিশিষ্ট শার্ট, পাঞ্জাবী পরিধান করে তার আস্তিনকে উপরের দিকে গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তবে অন্য পূর্ণহাত বিশিষ্ট কাপড় সঙ্গে না থাকলে একান্ত বাধ্য হয়ে উক্ত আধা হাত বিশিষ্ট কাপড় পরে নামাজ পড়লে অসুবিধা হবে না। অবশ্য পূর্ণহাত বিশিষ্ট জামা বা পোষাক থাকা সত্ত্বেও গেঞ্জি বা হাফহাত বিশিষ্ট জামা বা পোশাক পরে নামায পড়া নামাজের অতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অবহেলার নামান্তর। যা একজন মুমিন নামাযীর জন্য বড়ই অশোভনীয় এবং দুঃখজনক। উল্লেখ্য যে, সকল মাযহাবের কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে কাপড় মানুষ আপন কাজ কর্মে (কৃষি ও গৃস্থলীর কাজ, কল-কারখানার কাজ ও মাঠ-ঘাটের কাজ ইত্যাদি) এর সময় ব্যবহার করে, যে কাপড়গুলো সাধারণতঃ ময়লা-আবর্জনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। ওই সমস্ত কাপড়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। যখীরা কিতাবে একটি রিওয়াত (বর্ণনা) এমন আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক্বে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনৈক ব্যক্তিকে এ ধরনের কাপড় পরে নামায পড়তে দেখে ওই ব্যক্তিকে বলেন, ঠিক করে বল, আমি যদি এ ধরনের তুচ্ছ কাপড় পরে তোমাকে কোন মানুষের কাছে পাঠাই তুমি যাবে? সে বললো না, তখন হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন আল্লাহ্ তা'আলা এর চেয়েও বেশী হকদার তার দরবারে সৌন্দর্যমন্ডিত জামা/কাপড় পরে ও আদবের সাথে উপস্থিত হও। তাই পাক-সাফ ও পবিত্র পোষাক পরিধান করে নামায আদায়ে যত্নশীল ও মনোযোগী

হওয়া সকল মুসলমানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং মাঠে/জমিনে কাজ-কর্ম করার সময় ভাল ও নামাযের যোগ্য এক জোড়া কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং না হলে ভালভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অযু করতঃ উক্ত ভাল ও উন্নত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে। পুনরায় কাজের সময় কাজের পোষাক পরিধান করবে। এটাই নামাযের প্রতি আদব ও আন্তরিকতা। উপরোক্ত মাসআলা ও বিষয়ে বহু মানুষ উদাসীন। নামাযের সময় অনেক মুসল্লিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল একেবারে সাধারণ পোশাকে গেঞ্জি পরে বা খালি ও নগ্ন শরীরে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালীন সময়ে নামায আদায় করতে দেখা যায় অথচ শহর-বন্দরে বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ঘরে যাওয়ার সময় বহু দামী ও মূল্যবান জামা কাপড় পরিধান করতে দেখা যায়। বস্তুতঃ নামাযের প্রতি কত বড় অবহেলা ও উদাসীনতা? অথচ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তথা নামাযে সর্বোত্তম সুন্দর ও মুল্যবান শালীন জামা-কাপড় পরিধান করাই শিষ্ঠাচার ও নামাযের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। হাঁ, কোন গরীব-অসহায় মুসল্লির নিকট ভাল ও উন্নত মানের জামা-কাপড় নাই, শুধু একটি গেঞ্জি বা আধা হাত বিশিষ্ট একটি জামা আছে তখন উক্ত নামাযী উক্ত গেঞ্জি বা আধা হাত বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে হয়ে যাবে। তা উক্ত মুসল্লির জন্য মাকরূহ হবে না। এ মাসআলার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা সকলের জন্য জরুরী।

[ফতোয়ায়ে রজভীয়া, ৩য় খন্ড, ৪৪৪পৃ. রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, ৬৪০পৃ. ফতোয়ায়ে কাজীখান, ১ম খন্ড, ১০৬নং পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত-১ম খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা, ফতহুল কদির, কৃত. ইমাম ইবনুল হুমনাম হানাফী, ১ম খন্ড, ৪২৪পৃ., মুমিন কি নামাজ ১১তম অধ্যায় এবং আমার রচিত যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আসিফ হোসাইন**
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা,
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

❓ প্রশ্নঃ বিভিন্ন মসজিদে খতমে তারাবীর হাফেজদের জন্য হাদিয়া উত্তোলন করে সেখান থেকে মসজিদ কমিটি পূর্ণ হাদিয়া না দিয়ে রেখে দেয়? ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা জায়েজ হবে কিনা?

📖 **উত্তরঃ** পবিত্র মাহে রমজানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ খতমে কুরআনের মাধ্যমে নামাযে তারাবীহ আদায় করে থাকেন। তা অনেক উত্তম আমল। যেহেতু নামাযে তারাবীহতে এক খতম ক্বোরআন আদায় করা সুন্নাত। আর মাহে রমযানে আন্তরিকতার সাথে এশার নামাযের পর বিশ রাকাত নামাজে তারাবীহ আদায় করাও সুন্নাত। অত্যন্ত ফজিলতময় ও সওয়াবের আমল। নামাযে তারাবীহতে হাফেজ সাহেবগণ কুরআনুল করমি তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনে পাক খতম করেন বিধায় উক্ত নামাযে তারাবীহকে খতমে তারাবীহ বলা হয়। মাহে রমজানে হাফেজ সাহেবান অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠার সাথে যে সময় ব্যয় করেন, তার জন্য মুসল্লি বা মসজিদ পরিচালনা কমিটি তাদের প্রতি সম্মানস্বরূপ কিছু হাদিয়া/সম্মানি প্রদান করেন। এটা উত্তম আমল। মসজিদ পরিচালনা কমিটি উত্তোলনকৃত সমস্ত হাদিয়া মসজিদের খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, হাফেজ সাহেবানকে বন্টন করে দিবেন। এটাই নিয়ম। তবে মসজিদ কমিটি মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজন মনে করলে আলাদা টাকা সংগ্রহ করে উক্ত টাকা মসজিদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করবে। ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও হাফেজ সাহেবানের জন্য সংগ্রহকৃত হাদিয়ার কিছু অংশ যদি মসজিদের উন্নয়নে ব্যবহার করতে চান তখন মসজিদ পরিচালনা কমিটি মুসল্লিগণ, ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন ও হাফেজ সাহেবানের অনুমতি ও সন্তুষ্টিতে তাঁদেরকে যথাযথ/উপযুক্ত সম্মান করে উত্তোলনকৃত হাদিয়ার একটি অংশ বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ব্যয় করতে পারবে, তবে উত্তোলন ও হাদিয়া সংগ্রহ করার সময় ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন, খাদেম ও হাফেজ সাহেবানের হাদিয়ার কথা বলার সময় মসজিদের উন্নয়নের কথাও বলবেন। যাতে হাফেজ সাহেবান ও ইমাম, খতিব মুয়াজ্জিনের অন্তরে কষ্ট না পায়। উল্লেখ্য যে, খতম তারাবীহর জন্য দুই/তিন জন হাফেয সাহেবান নিয়োগ দানের সময় কোরবানী গরু খরিদ করার সময় যেভাবে দরদাম করে সেভাবে হাফেজ সাহেবানের সাথে দরদাম করবে না বরং তাঁদেরকে মসজিদ পরিচালনা কমিটি বা মতোয়াল্লি স্পষ্ট বলে দিবেন আপনারা খতমে তারাবীহ পড়াবেন আমরা আপনাদেরকে সম্মান করার চেষ্টা করব। এটাই উত্তম পদ্ধতি।

প্রশ্নঃ যারা মালেকে নেসাবের অধিকারী নয় তাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব কিনা? আর যারা ফিতরা নেয়, তাদের ফিতরা দিতে হবে কিনা?

উত্তরঃ পবিত্র মাহে রমজানের ফরজ রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্তি ও রোযার পরিপূর্ণতার জন্য তদুপরি ঈদুল ফিতরের দিন, গরীব ও অসহায় মুসলিম নর-নারীদের প্রতি সহায়তা প্রদানের জন্য সদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিধান। ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাদকাতুল ফিতর সাহেবে নেসাব ও সামর্থ্যবানদের জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে এটা আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণে কোন সময় নির্দিষ্ট বা বাধ্য করা হয়নি। যে রকম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে নামায পড়লে কাযা হয়ে যাবে। সুতরাং ফিতরার ক্ষেত্রে অন্য যে কোন মাসেও ফিতরা আদায় করা যাবে এমনকি ঈদুল ফিতরের পূর্বেও আদায় করা যাবে তবে শর্ত হল সাহেবে নেসাব বা নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ও বিত্তবান হতে হবে। অবশ্য সাদকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব ও উত্তম। যাতে সমাজের গরীব-অসহায় মুসলমান মিসকিনরাও সকলের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদের নামাযে শরীক হয়ে আনন্দ ও ঈদ উৎসবে শামিল হতে পারে। যে সব গরীব-মিসকিন নর-নারী যারা ফিতরা গ্রহণ করেছে তারা যদি যাকাত-ফিতরার অংশ গ্রহণের ফলে তাদের গ্রহণকৃত অর্থ/টাকার পরিমাণ ঈদুল ফিতরের দিন নেসাব পরিমাণ বা বর্তমান বাংলাদেশী মুদ্রা/টাকার হিসেবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা/ চাঁদার সম পরিমাণ তথা ৫৫/৬০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশী হলে তাদের উপর ফিতরা আদায় করা নিজের পক্ষ হতে এবং স্বীয় না বালেগ ছেলে-মেয়ের পক্ষ হতে ওয়াজিব হবে।

[দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, হিন্দিয়া ও যুগ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

মুহাম্মদ জাহেদ
চট্টগ্রাম

প্রশ্নঃ আমাদের এলাকার বিভিন্ন মসজিদে ফজর ও আসরের নামাযের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে দুরুদ শরীফ পাঠ করা হয়। জনৈক বাংলা শিক্ষিত ব্যক্তি এটার বিরোধিতা করে 'এটা পাঠ করা ওহাবী-জামাতের স্বভাব' বলে মন্তব্য করে মুসল্লিদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ায়। মুসল্লিদেরকে না পড়ার জন্য জোর তাকীদ করে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এ আমলের ফজিলত বর্ণনা করে উপকৃত করবেন।

উত্তরঃ জামাআতের সাথে পঞ্জেগানা ফরজ নামাযের পর যে সব ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আছে সে সব ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব ডান দিকে বা বাম দিকে বা কিবলার দিকে পিঠ করে মুসল্লিগণের দিকে ফিরে বসা এবং হাদিস শরীফে বর্ণিত জিকির-আযকার ও দোয়া পাঠ করা সংক্ষিপ্তাকারে এবং যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত ও নফল নামায ইত্যাদি নেই সেসব ফরয নামাযের জমাত আদায় করে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বেশীক্ষণ কুরআনের বিভিন্ন সূরা, আয়াত, দোয়া-দরূদ, ইস্তিগফার, হাদিস শরীফে বর্ণিত দোয়াসমূহ, জিকির-আযকার ইত্যাদি পাঠ করা সুন্নাত ও অত্যন্ত বরকতময় আমল। হাদীসে পাকে রয়েছে প্রত্যেক নামাযের পর এস্তেগফার, আয়াতুল কুরসি, কুল শরীফ ইত্যাদি পাঠ করা সুন্নাত। আর সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত কুরআনে পাকেরই অংশ। তাই সেগুলো ফজর ও আসরের জমাতের পর তেলাওয়াত করতে কোন অসুবিধা নেই বরং উত্তম। তাছাড়া সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন। যেমন জামে তিরমিযি শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

عن معقل بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرّاتٍ اعوذ باللهِ السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث ايات من سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي وان ما ت فى ذلك اليوم مات شهيدًا او من قالها حين يمسى كان بتلك االمنزل [رواه الترمذي]

অর্থঃ প্রিয়নবীর সাহাবী হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ভোর/প্রভাতে তিনবার 'আউযুবিল্লাহিস্ সামীইল আলীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম।' অথঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত

শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত করবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য (পাঠকারী বান্দার জন্য) দোয়া করতে থাকেন। পাঠকারী ব্যক্তি যদি সে দিন ইন্তেকাল করে তাহলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তদ্রুপ যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় তা পাঠ করবে সেও একই ফজিলতের অধিকারী হবে।

[জামে' তিরমিজি-২৯২ নং হাদিস]

সুতরাং এ বিষয়ে বাজে মন্তব্য করা অজ্ঞতা ও মূর্খতার নামান্তর। উল্লেখ যে, পঞ্জেগানা নামাযের প্রত্যেক ফরয নামাযের জমাতের পর ইমাম সাহেব ডান/বাম দিকে অথবা মুসল্লিদের দিকে বসা ও দোয়া-দরুদ পড়া সুন্নাত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী আমল দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে অনেক ইমাম সাহেবান গাফেল ও বেখবর।

[বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, নামায অধ্যায়,
সুনানে তিরমিযী শরীফ ও যুগ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ মুফাচ্ছেল চৌধুরী**
বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম
দাখিল মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

❓ প্রশ্নঃ যাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব নয় তাদের আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর ও ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হবে কিনা? জানালে ধন্য হব।

📖 **উত্তরঃ** কোরবানী ওয়াজিব না হলেও আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর ও ঈদুল আযহার নামায অবশ্যই পড়তে হবে যেহেতু কুরবানি ওয়াজিব হওয়া আর আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর পাঠ করা ও ঈদুল আযহার নামায আদায় করা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন- واذكروا الله فى ايّامٍ معدوداتٍ অর্থাৎ তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকদিন বেশি করে আল্লাহর জিকির/আল্লাহকে স্মরণ কর। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-২০৩]

এই আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে অধিকাংশ তাফসির বিশারদগণের মতে 'আইয়্যামে তাশরীক'কে বুঝানো হয়েছে আর তা মাহে জিলহজ্বের ১১, ১২ ও ১৩ এ তিন দিন। ঈদুল আযহার দিনসহ এ দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। কেননা এদিনসমূহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য জেয়াফতের দিন। হাদিসে পাকে এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ايام التشريق ايام اكل وشربٍ অর্থাৎ আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্বের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনসমূহ হলো পানাহার করার দিন। [সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২৫৭৩]

তাই এ দিনগুলোতে রোযা রাখা মানে মহান আল্লাহ্র দেয়া যেয়াফত/মেজবানকে প্রত্যাখ্যান করা যা মারাত্মক অপরাধ। এ দিনগুলোতে মহান আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণের নিমিত্তে হানাফী মাযহাব মতে জিলহজ্ব-এর ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর নামায পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিন প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আর একাকি পড়লে ফরজ নামাযের পর পুরুষের জন্য একবার উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব আর তিনবার পড়া মুস্তাহাব এবং মহিলারা পঞ্জেগানা ফরয নামাযের পর নিম্নস্বরে তাকবিরে তাশরীক পড়বে। আহনাফের মতে তাকবীরে তাশরীফ হলো- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ জামাতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক তাকবীর বলা ফরয নামায শেষ করার সাথে সাথে ওয়াজিব। আর ঈদের নামাজ আদায় তাদের ওপর ওয়াজিব যাদের ওপর জুমার নামায ফরয। এ প্রসঙ্গে নুরুল ঈযাহ্ কিতাবে বর্ণনা এভাবে এসেছে

صلوة العيد واجبة فى الاصح من تجب
عليه الجمعة بشراتطها

অর্থাৎ যার উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব এমন ব্যক্তির উপর জুমু'আর নামাজের শর্তাবলী স্বাপেক্ষে বিশুদ্ধতম অভিমত মোতাবেক ঈদের নামায ওয়াজিব।

[ঈদের নামায অধ্যায়, নুরুল ঈযাহ্, কৃত. আল্লামা হাসান ইবনে আলী আল ওয়াফায়ী (রহ.)]

সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কুরবাণী ওয়াজিব হোক বা না হোক উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক তাকবীরে তাশরীক পাঠ করাও কোরবানীর ঈদের নামায তথা ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করা সকল মুকিম, সুস্থ মস্তিস্ক, বালেগ, মুসলিম পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, সামর্থ্যবান তথা কোরবানীর দিনসমূহে (জিলহজ্ব মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ে) নেসাব পরিমাণ তথা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা। চাঁদি বা তৎ পরিমাণ টাকার মালিকের উপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আল্লাহর নামে তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উক্ত দিনসমূহে কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব। আর স্বীয় নাবালেগ সন্তান-সন্ততির পক্ষে কোরবানী করা মুস্তাহাব। নেসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক না হলে উক্ত দিনসমূহে সওয়াবের নিয়তে

কোরবানী করা নফল। কিন্তু আইয়্যামে তাশরিকের তাকবির ও কোরবানীর ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়া অপরিহার্য নয়। আর তাকবীরে তাশরিক ইমাম আযম হযরত আবু হানিফার মতে সুন্নাত আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতে সকলের উপর ওয়াজিব। আর এটা অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়াকে বিশুদ্ধতম অভিমত বলা হয়েছে যেমন প্রসিদ্ধ ফিক্হ্ গ্রন্থ যেমন تنو الابصار (তানভিরুল আবছার), الدر المختار (আদদুরুল মুখতার) হানাফী মাযহাবের অন্যতম কিতাবে ইমাম আলাউদ্দিন খাসকপি হানাফী রহ. বলেন- ويجب تكبير التشريق فى الاصح অর্থাৎ তাকবিরে তাশরিক বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী ওয়াজিব। এ বিষয়ে অন্যান্য অভিমতও আছে।

[আদদুররুল মুখতার,২য় খন্ড, ১৭৭পৃ. و باب العيدين
আর রদ্দুল মোহতার, কৃত. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহ. ২য় খন্ড, ১৮০পৃ. ঈদের নামায অধ্যায়]

◈ প্রশ্নঃ মহিশ বা গয়াল ও হরিণ দিয়ে কোরবানী হবে কিনা?

📖 **উত্তরঃ** মহিষ, বহিষ, গরু-ছাগল (ছাগী ও হাসি) ভেড়া-দুম্বা, উট, ষাড়ের ন্যায় বলদ গরু ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল পশু দ্বারা কুরবানী করা নিঃসন্দেহে জায়েয বা বৈধ। আর গয়াল ও হরিণ সাধারণত ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে বন্য বা জঙ্গলী পশুর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু কুরবানির জন্য হালাল ও পোষ্য গৃহ-পালিত পশু অপরিহার্য। তাই যে সব হালাল পশু সাধারণতঃ গৃহ পালিত ও পোষ্য নয় বরং বন জঙ্গলে ও পাহাড়ে যাদের বসবাস (সেগুলো ঘরে/বাড়ী/খামারে পালনের ব্যবস্থা করলেও তা দিয়ে কুরবানি শুদ্ধ নয়। এ কারণে গয়াল ও হরিন দিয়ে কুরবানি শুদ্ধ হবে না। তবে মুসলমানের ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিয়ে, শাদী, ওরস-ফাতেহা ও জেয়াফত ইত্যাদি গয়াল ও হরিণ আল্লাহর নামে জবেহ করে খাওয়া জায়েয বা বৈধ।

✍ **মুহাম্মদ আবদুর রহমান**
সভাপতি, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ
৮নং চাতরী ইউনিয়ন শাখা, আনোয়ারা
চট্টগ্রাম।

◈ প্রশ্নঃ একজন আলেম জুমার নামাজের পূর্বে খুৎবার আলোচনায় বলেন এলাকার পার্শ্ববর্তি মাদরাসাকে অভাবে রেখে দূরের মাদরাসাকে যাকাত ফিতরার টাকা দিলে তা আদায় হবে না। ক্বোরআন-হাদিসের আলোকে জানালে ধন্য হব।

📖 **উত্তরঃ** ইসলামে যাকাত আদায়ের খাতসমূহ সুনির্দিষ্ট। যা পবিত্র ক্বোরআনের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। কোন যাকাতদাতা যদি সে সকল খাতসমূহে তথা গরীব, মিসকিন, অসহায়, এতিম ও বিধবাকে যাকাতের টাকা প্রদান করে আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, যাকাত ফিতরা প্রদানের সময় নিকটতম গরীব আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ একদিকে তারা গরীব অপরদিকে আত্মীয়তার হক। তবে কেউ যদি নিজের সমস্ত যাকাত-ফিতরার অর্থ নিজের পছন্দের সুন্নী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ্ ফান্ড বা মিসকিন ফান্ডে প্রদান করে অথবা স্বীয় গ্রামের নিজ এলাকার মাদরাসা বদ আকিদায় পরিচালিত হওয়ায় সেখানে প্রদান না করে সুন্নী কোন দুরবর্তী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মিসকিন ফান্ডে প্রদান করে সেক্ষেত্রেও যাকাত-ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। তাই কেউ যদি বলে দূরের প্রতিষ্ঠানে দিলে যাকাত আদায় হবে না- এটা নিছক মিথ্যা ও ভুল এবং অজ্ঞতার নামান্তর। উল্লেখ্য যে, যে সকল মাদরাসা/প্রতিষ্ঠান আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ পরিপন্থী এবং বাতিল আকিদা পোষণ করে সে সব মাদরাসা/প্রতিষ্ঠানে যাকাত ফিতরার অংশ দান করা হারাম, এ সব প্রতিষ্ঠানের মিসকিন ফান্ডে যাকাত ফিতরা দান করলে আদায় হবে না যেহেতু সেখান থেকে মুনাফিক তথা নবী অলির শানে কটুক্তিকারী নবী দিদ্বেষী বের হয়। সুতরাং সেখানে যাকাত/ফিতরার অংশ দেয়ার অর্থ আল্লাহ্-রসূলের দুশমন/শত্রুকে সাহায্য করা। আর যে সব প্রতিষ্ঠানে গরীব, অসহায় ও এতিম ছাত্রদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা নাই সেখানেও যাকাত ফিতরা প্রদান করা যাবে না। যাকাত/ফিতরা গরীব-মিসকিন ও অসহায়দের হক, তা মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ ও ফোরকানিয়ার দালান বা ঘর নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না। এ বিষয়ে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে বহুবার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

◈ প্রশ্নঃ মাদরাসায় কোন লিল্লাহ্ ফান্ড মিসকিন ফান্ড নাই উত্তোলিত যাকাত-ফিতরার টাকা দিয়ে মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন দেওয়া শরীয়তসম্মত কিনা? জানালে ধন্য হব।

📖 **উত্তরঃ** যে সকল প্রতিষ্ঠানে লিল্লাহ্ বা মিসকিন ফান্ড নেই সেসব প্রতিষ্ঠানে যাকাত-ফিতরার অর্থ প্রদান করলে শুদ্ধ হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে মহান রব্বুল আলামীন মোট ৮ শ্রেণীর লোক যাকাতের হকদার (বা যাদেরকে যাকাত দেয়া শুদ্ধ) বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

অর্থাৎ নিশ্চয় যাকাত কেবল ১. ফকীর, ২. মিসকিন, ৩. যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে, ৪. যাদেরকে ইসলামের দিকে চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, ৫. দাস-দাসী মুক্তির জন্য, ৬. ঋণ গ্রস্থদেরকে ঋণ হতে মুক্তির জন্য, ৭. আল্লাহর পথে মুজাহেদীনে ইসলামের জন্য ও ৮. মুসাফিরদের জন্য যে সফরে শুন্য হাত হয়ে পড়েছে। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা]

সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে উপরোক্ত আট প্রকারের মধ্যে ৪ নং খাত রহিত হয়ে গেছে। চতুর্থ নং খাত ছাড়া বাকি সাত শ্রেণীর লোকদেরকে যাকাত দেওয়া শুদ্ধ। উল্লেখ্য যাকাতের টাকা দিয়ে শিক্ষক, ইমাম-মুয়াজ্জিনকে সরাসরি বেতন হিসেবে এবং মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ জায়েয নেই। হ্যাঁ, ইমাম, শিক্ষক ও মুয়াজ্জিন যদি নিতান্তই গরীব-অসহায় হয়, আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয় এবং যাকাত গ্রহণের যোগ্য হয় তখন তাকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে যাকাতের টাকা বেতন বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নেই।

উল্লেখ্য যে, যাকাতের টাকা হতে শিক্ষক, ইমাম ও মোয়াজ্জিনের মাসিক বেতন বা হাদিয়া প্রদান করলে তা একজন গরীবের মাধ্যমে হিলা করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে যাকাতের টাকা গরীবকে যাকাতের উদ্দেশ্যে প্রদান করবে। গরীব ব্যক্তি তা গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় শিক্ষক, ইমাম ও মোয়াজ্জেনের বেতন বাবদ হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করবে। তদ্রুপ মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণে সরাসরি যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে না তবে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণে অন্য কোন সুযোগ না থাকলে তখন হিলার মাধ্যমে উপরোক্ত নিয়মে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা যাবে।

[ফতোয়ায়ে রজভিয়া, কৃত. ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা ফাজেলে বেরলভী রহ. ১০ম খন্ড, ১০৬পৃ., রেজা ফাউন্ডেশন লাহোর হতে প্রকাশিত ও ফাতোয়ায়ে আহলে সুন্নাত আহকামে যাকাত-কৃত. মুফতি আবু মুহাম্মদ আলি আছগর মদনী, পৃ. ৫৫১]

✍ **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**

❓ **প্রশ্নঃ বড় ভাইয়ের শাশুড়ীকে তাঁর আপন ছোট ভাই বিয়ে করা জায়েয আছে কিনা? কুরআন হাদিসের আলোকে জানালে ধন্য হব।**

📖 **উত্তরঃ** পরিবার গঠনের প্রথম ধাপ হলো বিয়ে। ইসলামী শরিয়তে সামর্থ্যবান পুরুষের জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হলে বিয়ে করা ফরজ। এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মহর আদায় ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা ইসলামী শরীয়তে সুন্নাত ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মানবতা, সাম্য, সৌহার্দ্য শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলাম। তাই সমাজ-রাষ্ট্রে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে নারীদের মধ্য থেকে পুরুষের জন্য যাদেরকে বিয়ে করা অনুমতি নেই বরং বিবাহ্ করা হারাম তাদেরকে মুহরিমাত বলা হয়। আর যাদেরকে বিয়ে করা জায়েয বা বৈধ তাদেরকে গাইরে মুহরিমাত বলা হয়। মহিলাদের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম তা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, বোনগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যা (ভাইজিগণ), ভাগ্নিগণ, তোমাদের ওইসব মাতা যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন, তোমাদের দুধু বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ, তথা শাশুড়ীগণ, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের আগের সংসারের কন্যা যারা তোমাদের কোলে তথা লালন-পালনে আছে। যদি স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে তাদের আগের কন্যাকে বিবাহ করলে তোমাদের জন্য কোন গুনাহ্ নেই। তদ্রুপ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য হারাম এবং দুই বোন (সহোদর হক বা দুধবোন)কে একত্রে বিবাহ করাও হারাম কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অতীতে বা জাহেলী যুগে তোমরা যা করেছো তা মাফ।) নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু। [সূরা নিসা, আয়াত-২৩]

এর পরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَاُحِلَّلَكُمْ مَاوَرَآءَ ذٰلِكُمْ الاية... অর্থাৎ নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া যাদের বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তোমাদের জন্যে অন্যসব নারীকে (বিবাহ্ করা) হালাল করা হয়েছে। [সূরা নিসা, আয়াত-২৪]

সুতরাং মুহরিমাত বা বিয়ে করা হারামের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় আপন ভাইয়ের শাশুড়ীকে বিয়ে করা যাবে, যদি উক্ত নারী তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা হয় কিন্তু স্বামী থাকা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ্ করা হারাম।

প্রশ্ন: যদি কোনো একজন ছেলে কোন ধরনের রক্তের সম্পর্ক নেই এবং মুহরিম নয় এমন মহিলাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে করতে পারবে কিনা?

উত্তর: মুহরিমাত বা যাদেরকে বিবাহ্ করা হারাম নয় এমন নারীর সাথে বিবাহ্ বন্ধন ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ। যা সূরা নিসার ২৪নং আয়াতে করিমা দ্বারা প্রমাণিত।

makashemmeraza

প্রশ্ন: ফজরের নামায কতক্ষণ পর্যন্ত পড়া যাবে। এরপরে পড়লে কাযা হবে? কীভাবে কাযা নামায পড়তে হয়? কাযা নামাজের নিয়ত কীভাবে করতে হবে? জানালে ধন্য হব।

উত্তর: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময়সূচী। ফজরের নামাযের সময় চলে যাওয়ার পর ফজরের নামায পড়লে তা হবে কাযা, আর যদি ফজরের নামাজ কাযা হয়ে যায় তাহলে সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর হতে ওই দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে ফজরের নামায কাযা আদায় করলে তবে ফজরের ফরজের সাথে সুন্নাতেরও কাযা আদায় করবে। ফজরের নামাযের সুন্নাত ছাড়া আর কোন সুন্নাতের কাযা পড়তে হয় না। যদি ফজরের নামাযের কাযা দ্বিপ্রহরের পর অথবা ওই দিনের পর আদায় করা হয় তবে তখন সুন্নাতের কাযা করতে হবে না। শুধু ফরযের কাযা আদায় করবে। শুধুমাত্র ফজরের সুন্নাত নামাজ যদি কাযা হয়ে যায় তাহলে সূর্যোদয়ের পর সূর্য একটু উপরে উঠার পর বা সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর আদায় করবে। উল্লেখ্য সূর্য অস্থ, মাথা বরাবর ও সূর্যোদয়ের সময় যে কোন নামাজ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত-নফল, কাযা এবং তেলাওয়াতে সিজদাও সাহু সাজদা আদায় করা জায়েয নেই। যে কোন নামায কাযা হলে অন্তরে কাযার নিয়ত করলে কাযা আদায় হয়ে যাবে।

[রাদ্দুল মুহতার, দুররে মুখতার, ফাতওয়া-এ রজভীয়্যাহ্ ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৬২, ৬১৬, ৬২০ ও ৭১৪, বাহারে শরীয়ত, নামাজ অধ্যায় ও মুমিন কি নামাজ, ৭ম অধ্যায়]

আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ
সিলেট

প্রশ্ন: যদি মসজিদ স্থানান্তর করা হয় তাহলে মসজিদের নামে দানকৃত জায়গা দানকারীর মালিকানায় চলে যাবে। এতে কেউ কোন ধরনের আপত্তি করতে পারবেন না। ফি সাবিলিল্লাহ্ দান না করে এ ধরনের শর্ত আরোপ করে বা মালিকানায় রেখে ওয়াকফ কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর: মসজিদের ওয়াকফের ক্ষেত্রে প্রশ্নে উল্লেখিত এ ধরনের শর্ত আরোপ করা শর্তে ফাসেদ ও না জায়েয। তাছাড়া আল্লাহর রাস্তায় মসজিদের জন্য ওয়াকফ কৃত জমি পরবর্তীতে উত্তরাধিকার হিসেবে দাবী করতে পারবে না। মসজিদের জন্য ওয়াকফ কৃত মৌখিক বা লিখিত হোক জমি আল্লাহর মালিকানায় চলে যায়। আর যে জায়গায় একবার মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং নামায ও জুমা-জামাত আদায় করা হয়েছে সে মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত বা কোন কারণে নামায ও ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যবহৃত না হলেও তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সে জায়গাকে সম্মান করতে হবে। কোন প্রকার বেহুরমতি ও অসম্মান যেন না হয় সেদিকে এলাকাবাসীকে খেয়াল/দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব আদ্‌দুররুল মুখতার ফতোয়াগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- ان المسجد الى عنان السماء অর্থাৎ মসজিদ আসমান পর্যন্ত। আর রদ্দুল মোহতার ফতোয়াগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে كذا لى تحت الثرى অর্থাৎ তদ্রুপ মসজিদ সর্বনিম্ন তাহতুছ্ ছারা পর্যন্ত। বস্তুতঃ মসিজদের চিহ্নিত জায়গা বরাবর উপরে আসমান নিম্নে তাহতুছ্ ছারা পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং এ ধরনের শর্ত আরোপ করা 'কোন দিন মসজিদ স্থানান্তর করা হলে মসজিদের জন্য দানকৃত জায়গা দানকারীর মালিকানায় চলে যাবে এতে কেউ কোন ধরনের আপত্তি করতে পারবে না। না জায়েয ও গুনাহ্। এ ধরনের দান ফি সাবিলিল্লাহ্ হবে না। স্বীয় মালিকানা স্থির রেখে ওয়াকফ করলে ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক উক্ত ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না এবং শরয়ী মসজিদ হবে না।

[আদদররুল মুখতার কৃত, আল্লামা ইমাম আলা উদ্দীন খাসকাফী হানাফী ও রদ্দুল মোহতার, কৃত. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং পূর্বে তরজুমানে প্রশ্নোত্তর বিভাগে পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রবন্ধ

মসজিদুল আকসার গুরুত্ব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালামের সময়কালে বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসার নির্মাণ সমাপ্ত হয়। পবিত্র কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে মসজিদুল আকসার কথা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত তাফসির ও হাদীস বিশারদ হযরত ইমাম বগভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদুল আকসা নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালামের পিতা হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম। (এটি অনেক নবীদের কিবলা। প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর প্রায় ১৬/১৭ মাস এ মসজিদের দিকে নামাজ আদায় করেছেন।) মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালামকে নবুয়ত ও সাম্রাজ্যধিকার করা এবং মসজিদুল আকসা নির্মাণ তাঁর মাধ্যমে সমাপ্ত করা। হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের ইন্তেকালের পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালামকে নুবূয়ত প্রদান করেছিলেন এবং প্রাণীকুল তথা জীব-জন্তুর ভাষা বুঝার ক্ষমতা দান, তথা বায়ু এবং জীনজাতিকে তাঁর অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। জিনেরা তাঁর খেদমতে মশগুল থাকত। কোন জীন তার অবাধ্য হতে পারতনা। হলেই তাদেরকে আগুনের দুররা দিয়ে বেত্রাঘাত করা হত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে করীমে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّه□ □-وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ(١٢) يَعْمَلُوْنَ لَه□ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ□ -

অর্থাৎ কতেক জিন তাঁর সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ইচ্ছা অনুযায়ী ত দুর্গ-ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেক নির্মাণ করত।

[সূরা সাবা, আয়াত-১২-১৩]

আর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণে হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম জিনদেরকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তিনি তাদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। জিনদের কাজের প্রকৃতিও ছিল বিভিন্ন রকম। আর মসজিদুল আকসা নির্মাণে ব্যবহৃত শ্বেত মর্মর পাথরগুলো তিনি তাদেরকে দিয়ে উত্তোলন করিয়েছিলেন খনি থেকে। এরপর স্থপতি ও প্রকৌশলীদের মাধ্যমে পাথরগুলোকে মসৃণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপে সাজানো হয়। মণি-মুক্তা দিয়ে অংকন করিয়ে নেয়া হয় বিভিন্ন রকমের নয়নাভিরাম নকশা। দেয়াল ও মেঝ তৈরি করা হয় শ্বেত ও পীত বর্ণের মর্মর পাথর দ্বারা এবং ফিরোজা বর্ণের গালিচা বিছিয়ে মেঝকে পরিপাটি করা হয়। এভাবে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদুল আকসার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। উইকিপিডিয়া ও ইতিহাসগ্রন্থে রয়েছে এটি ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়।

হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম এটি নির্মাণের পর ঘোষনা করলেন আমি এ সুদৃশ্য মসজিদ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্মাণ করেছি। এর বাইরে ও অভ্যন্তরের সবকিছু একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ সমাপ্তের পর আল্লাহর দরবারে হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম ৩টি দোয়া করেছিলেন। ১. আল্লাহ্ যেন তাঁকে প্রত্যুৎপন্ন মতি দান করেন, যাতে যে কোন জটিলতার সমাধান ত্বরিৎ গ্রহণ করতে পারেন, ২. তাঁর সকল সিদ্ধান্ত যেন আল্লাহর অনুকুলে হয়, ৩. তিনি আরো দোয়া করেন হে প্রভু! আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমার পরে আর কারো জন্য সমূচিত না হয়। তিনি আরো নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্ যে এ মসজিদে ২ রাকাত নামাজ আদায় করবে, তাকে তুমি সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ করে দিও। হাদিসে পাকে উল্লেখ আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, মসজিদে হারাম বা

বায়তুল্লাহ্ মক্কায় অবস্থিত। তিনি পুনরায় আরয করলেন, অতঃপর কোনটি? জবাব দিলেন মসজিদুল আকসা! আমি আরয করলাম উভয় মসজিদের মাঝে ব্যবধান কত ছিল? তিনি এরশাদ করলেন ৪০ বছর। অতঃপর তুমি সালাতের (নামাজ) সময় যেখানেই পাবে সেখানেই নামায আদায় করে নিবে। কেননা গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৫৮৫ ও ৩৪২৫]

মসজিদুল আকসা ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র ও অতি বরকতময় স্থান। প্রিয়নবী মিরাজ রজনীতে এ মসজিদে নবী-রসূলের জামাআতে ইমামতি করেছিলেন বলেই সেদিন থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইমামুল মুরসালিন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

এ মসজিদের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে পাকে উল্লেখ রয়েছে প্রিয়নবীর বিশিষ্ট খাদেম সাহাবীয়ে রসূল হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন নূরানী রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিজ ঘরে আদায়কৃত নামাজের সওয়াব ১ গুণ, সাধারণ মসজিদে ২৫ গুণ, জামে মসজিদের ৫০০ গুণ, মসজিদে আকসায় ১ হাজার গুণ, আমার মসজীদে (নববীতে) ৫০ হাজার গুণ এবং কাবায় তথা মসজিদুল হারামে ১ লক্ষ গুণ নেকী ও সওয়াব পাওয়া যায়। সহি বোখারীতে মসজিদে নববীতে এক রাকাতে ১০০০ (এক হাজার) গুণবেশী আর সুনানে ইবনে মাজায় মসজিদে নববীতে এক রাকাতে ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) আর মসজিদুল হারামে এক লক্ষ ও মসজিদে আকসায় এক রাকাতে ২৫ হাজার গুণ বেশী নেকী ও সাওয়াবের বর্ণনা রয়েছে।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ রয়েছে যখন হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ সমাপ্ত করলেন তখন বনী ইসরাঈল থেকে ১০ হাজার আসমানী কিতাবের পাঠক নির্বাচন করেন। দিনে ৫ হাজার ও রাতে পাঁচ হাজার পাঠক আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতেন। ৪৫৩ বছর পর্যন্ত এ মসজিদের ভিত্তি অটুট ছিল। কিন্তু জালিম বাদশা বখতনসর বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে মূল্যবান মণি-মুক্তা লুট করে নিয়ে ইরাকে চলে যায়। তার মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৭০ বছর ধ্বংস অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্তমান মসজিদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুণঃনির্মিত ও সম্প্রসারিত করা হয়। ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ও ১০৩৩ খ্রিস্টাব্দে দুবার ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে যথাক্রমে আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ও ফাতেমীয় খলিফা আলী আজ-জাহির পুণঃনির্মাণ করেন যা আজো অবধি টিকে রয়েছে।

[হিস্ট্রি অব আল আকসা মস্ক, www.justislam.com.uk]

১৯৬৭ সালে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইহুদী ইসরাঈলী বাহিনী ফিলিস্তিন ভূমি দখল করে মসজিদে আকসাসহ পুরো এলাকার উপর সার্বভৌমত্ব দাবী করে; কিন্তু ফিলিস্তিনিদের দাবী-মসজিদ ও পূর্ব জেরুজালেমের অন্যান্য ইসলামী নিদর্শন এবং স্থাপনাগুলোর সম্পূর্ণ অধিকার তাদেরই। এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বর্বর জালেম ইহুদীরা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিদের নির্মমভাবে শহীদ করে আসছে প্রায় ৮০ বছর ধরে। সম্প্রতি হামলায় প্রায় ২৫০ জনেন অধিক নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। অনেক মুসলিম মা-বোনসহ ছোট ছোট শিশু সন্তান পর্যন্ত তাদের হামলা হতে রক্ষা পায়নি। যা বর্তমান গোটা বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এসব জালেমদের হতে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে আকসাকে রক্ষা করুন। আমিন।

লেখক: মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া (দরসে নেজামী), কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।

নতুন মেরুকরণে ফিলিস্তিন

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

ইহুদী নাসারা মুসলমানদের জন্মান্তরের শত্রু, জানি দুশমন, মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে আমাদের বারংবার সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা, কারণ তারা অভিশপ্ত। ইহুদীরা এমন বর্বর জুলুমবাজ পৈশাচিক যে, দুইজন উচুঁস্তরের নবী হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইয়াহিয়া আলায়হিস্ সালামকে শহীদ করেছেন। পাপিষ্ট নরাধম তারা অভিশপ্ত হবে না তো কারা হবে? তাছাড়া এখন বিশ্বে ধর্ম বলতে ইসলাম বিদ্যমান। আর কোন ধর্ম নেই, বাকীগুলো ধর্মের লেবাসে আল্লাহর রসূল, নবী-ওলী বিদ্বেষী বানোয়াট গল্পের নাটক মঞ্চস্থ করছে। তাদের নিকট ঈমান-আক্বীদা, মানবতা বলতে কিছুই নেই। সবকিছু লাম্পট্য, উশৃংখলতার উল্লসূলন বৈ কিছুই নয়। বিশ্বায়নের যুগে ধ্রুপদী লয় টালমাটাল করে তুলেছে সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষের যুগ বর্তমানে বিরাজ করছে। এ দুষ্টচক্রের বাইরে অবস্থান করাটা এক সুকঠিন বিষয়। আপনাকে নিয়ে আপনি চলতে পারবেন, এ রকম ভাবার অবকাশও নেই। বিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর এডলফ হিটলার নাৎসী বাহিনী দিয়ে কেন ইহুদী নিধনে মেতে উঠেছিলেন জানিনা, তবে লক্ষ লক্ষ ইহুদী নিধন করেছে হিটলার। হয়তো বিশ্ব থেকে সব ইহুদী ধ্বংস হয়ে যেতো, যদি না হিটলার ক্ষমতা বিস্তৃত করার মোহ ত্যাগ করতো বা বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া ও অন্যদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে না যেতো, হিটলারের পতনের মধ্য দিয়ে ইহুদী নাসারাদের উত্থানের জোয়ার সৃষ্টি হলো। কথায় বলেনা 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট'। ব্যাপারটা ঠিক এ রকমই। হিটলার আত্মহত্যা করলো জার্মানি দু'ভাগ হয়ে পরাধীন হয়ে গেল আক্ষরিক অর্থে। রাশিয়া ও অপর মিত্র শক্তির বলয়ে চলে গেল হিটলারের বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ। ১৯৪৫ সালে হিটলারের পতন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইহুদীদের পুণর্বাসনের দায়িত্ব নিল বৃটেন। ১৯৪৭ সালে বিতাড়িত ইহুদী প্যালেস্টাইনে স্থিত হন। নতুন রাষ্ট্র ইসরায়েল মুসলমান তথা লক্ষ লক্ষ নবী রসূল'র জন্মস্থান এবং বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে তৎপর হয়ে ওঠে। পরাশক্তিগুলো তাদের ইন্ধন যোগায়। মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদ জানাল ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলনা তাতে কিছু আসে যায় না। জাতিসংঘের সদস্য হয়ে গেল এমনকি আনবিক বোমার মালিক বনে গেল। দুঃখ, অপমানে বিক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনীরা মুসলিম বিশ্বের সহায়তায় প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। আন্দোলন সংগ্রাম করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী গড়ে উঠে গাজা ও পার্শ্ববতী এলাকায় ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত কুটনৈতিক সমাধানের জন্য জোর লবিং শুরু করলেন বিশ্বব্যাপী। তাঁর যৌক্তিক আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশ্ব মোড়ল ও জাতিসংঘের হুঁশ হলো; কিন্তু ফিলিস্তিনীদের একটি দল বিশেষ করে হামাস যুদ্ধ করে সমাধান খুঁজে নেয়ার পক্ষপাতি। ইয়াসির আরাফাতের পদক্ষেপ প্রশ্নবিদ্ধ হলে স্বদেশে নিরস্ত্র নিরীহ্ জনতার পক্ষে যুদ্ধে সমাধান খুজে পাওয়া কঠিন। এ কথা হামাস নেতারা বুঝতে চান না। প্যালেস্টাইন লিবারেশন সংস্থা (PLO) ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে বিশ্বের অনেক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। শান্তি আলোচনার মাধ্যমে দু'রাষ্ট্র নীতির কথা সামনে এসে যায়। অধিকার আদায় করতে গেলে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তির মধ্যস্থতায় স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র স্বীকৃতি আদায় করতেই হবে। শক্তি প্রয়োগে কোন সমাধান মিলবে না এ কথা ফিলিস্তিনের হামাসসহ কয়েকটি উপদল মানতে নারাজ। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন এমন কি অনেক দেশ হতে যোদ্ধাও সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ হতে প্রায় আট হাজার স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা স্বইচ্ছায় ফিলিস্তীনে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

ক বছর আগে বেঁচে থাকা সকলেই ফিরে এসেছে। ১৯৬৭ সালে ইস্রায়েল অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে দেয় ভোর রাত্রে। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, সিনাহই, গোলান মালভূমিসহ কয়েক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জবরদস্তি দখল করে নেয়। মুসলিম দেশের বিমান, যুদ্ধ জাহাজ মাটিতেই ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক বছর ঐসব এলাকা ইস্রায়েলের দখলে ছিল। এখনো অনেক এলাকা ইস্রায়েল বাহিনীর দখলে। ১৯৭৩ সালে মিশরের অভিযানে বাধ্য হয়ে সিনাই ও গোলান মালভূমির দখলকৃত এলাকা ছেড়ে দেয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে। ত্রি-পক্ষীয় শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। দু' রাষ্ট্র ভিত্তিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায়। ইয়াসির আরাফাত ইয়ামেনী প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্ববাসী ও ফিলিস্তিনীদের চোখে মুখে আশার আলো দেখা গেল। চুক্তি মোতাবেক কিছু কিছু কাজ শুরু হলো। ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর আবারো দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বায়তুল মুকাদ্দাস অবরুদ্ধ রাখা হয় গাজার পশ্চিম তীর দখলের পুরানো পাঁয়তারা শুরু করে ইহুদীরা। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। ইঙ্গ মার্কিন জোট সব সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দৃশ্যমান ও গোপনে ইস্রায়েলকে সাহায্য করে চলেছে অদ্যাবধি।

সম্প্রতি ১০ দিনের ইস্রায়েলী আগ্রাসনে বোমাবর্ষণে নিরীহ শিশু, কিশোর, আবাল, বৃদ্ধ বণিতা প্রাণ হারায়। হাজার হাজার ফিলিস্তিনী পঙ্গুত্ব বরণ করে, শত শত (বহুতল বাড়িসহ) বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অসহায় ফিলিস্তিনীদের কান্নার আহাজারিতে বিশ্ববিবেক কিছুটা নড়েচড়ে বসেন। মিশরের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ'র মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতিতে বাধ্য হয়। এরপরেও ফিলিস্তিনীদের পোশাক পড়ে আরবী জানা ইহুদীরা ফিলিনিস্তীদের সাথে মিশে গিয়ে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আরব আমিরাত তেলআবিবে কুটনৈতিক মিশন খুলে বসেছে আরব বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে। ১৯৯৬ সালে ইস্রায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়েছিল জর্দান, গত আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি সই করে সংযুক্ত আরব আমিরাত, তেলআবীবে নিযুক্ত আমিরাত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ মাহমুদ আল খাজাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ খান বশির আল মাকতুমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাকে আমিরাত ইস্রায়েলের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীরতর করার জন্য কাজ করতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন উভয় দেশের মধ্যে শান্তি, সহাবস্থান ও ধৈর্যের সংস্কৃতি আরো বিকশিত হয়। ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আরব দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্ক খারাপ ছিল। এত বছর পর ট্রাম্প প্রশাসনের তৎপরতায় সে অবস্থান থেকে সরে এসে গত বছর (২০২০) ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক গড়ে আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কোর মতো মুসলিম দেশগুলো। আবুধাবীতে ইস্রায়েলের দূতাবাস খোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। সম্প্রতি গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংগে দখলদার ইস্রায়েলীদের রক্তক্ষয়ী ১১ দিনের যুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে তদন্তের অনুমোদন দিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ এম্যানেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ও যুদ্ধাপরাধের জন্য ইস্রায়েলকে দায়ী করেছে। এবার হামাস ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি আরও সংহত করে গাজা, পশ্চিম জেরুজালেম আল-আকসা, শেখ জাররাহ্ এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফেরাতে বৈঠকের আয়োজন করেছে যুদ্ধবিরতি মধ্যস্থতাকারী মিশর। ইস্রায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কায়রো এসে পৌঁছে বলেন, আমি ১৩ বছর পর কায়রো এসেছি। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ফিলিনিস্তীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান পশ্চিম জেরুজালেম পবিত্র আল-আকসা মসজিদসহ ওই এলাকায় অবস্থিত সকল ধর্মীয় স্থাপনার বিষয়টি মাথায় রেখে মিশর দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছে। স্থায়ী শান্তি ফেরাতে মিশরের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। খবর (আল-জাজিরা)। ইস্রায়েল বরাবরই আকারে ইঙ্গিতে বলে আসছে ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে আলোচনা চালানো হলে ইতিবাচক ফল পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা কি তাদের মনের কথা না কি মোনাফেকী তা বুঝার সময় এসে গেছে।

সম্প্রতি ইস্রায়েলের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ১২০ আসনের সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিরোধী দল (আসন সংখ্যা-৬২) কোয়ালিশনে সরকার গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। সুখকর বিষয় আরব ইসলামী রা'ম দলনেতা মনসুর আববাস ৪টি আসনে জয়ী জোট সরকারে ক্ষমতাধীন হচ্ছেন। এতদ্কালে এই প্রথম কোন মুসলিম দল ক্ষমতার অংশীদার হতে চলেছে এবার। উল্লেখ্য ইস্রায়েলের মোট জনসংখ্যার শতকরা বিশ (২০%) শতাংশ মুসলিম। মনসুর আববাস খুব বেশি আশাবাদী নন, কেননা জোটে কট্টরপন্থী রয়েছে অনেক।

ইস্রায়েল মুসলিম দেশগুলোকে আকৃষ্ট করতে দেশটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনেক নিয়মনীতিই বদলে ফেলেছে, যেসব দেশ ইস্রায়েল ভ্রমণে নিবৃত রাখতে নানা রকম ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছে, তাদের জন্য ইস্রায়েল আর পাসপোর্টে ভিসার স্ট্যাম্প লাগায় না এবং দেশটিতে ঢোকা ও বেরোনোর কোন সিল ছাপ্পড়ও দেয়া হয় না। আলাদা কাগজে ভ্রমণ অনুমতি দেয়। কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই এমন দেশগুলোর হাজার হাজার মানুষ ইস্রায়েল ভ্রমণ করছে, বাংলাদেশ পাসপোর্ট হতে ইস্রায়েল ব্যতীত কথাটা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোপূর্বে বিশ্বের ১ম ও ২য় মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পাসপোর্টেও কথাটা বাদ দেয়া হয়েছে। সুদান ও মরক্কো ট্রাম্প প্রশাসনের আব্রাহাম চুক্তিতে সইয়ের পরপরই সুদানকে সন্ত্রাসী তালিকা হতে বাদ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। মরক্কো ও আমিরাতের মতো শতকোটি ডলারের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পায়। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এখনো এ ধরনের সমঝোতায় রাজি হয়নি। সৌদি আরব, আলজিরিয়া ও ইরান উল্লেখযোগ্য। বিগত ৭০ বছরে যে শান্তি ও স্বীকৃতি অর্জিত হয়নি নতুন মেরুকরণে তা কতটুকু সফলতা আনবে তার অপেক্ষায় মুসলিম বিশ্ব ও মানবতাবাদী দেশসমূহ। যুদ্ধবিরতি কার্যকর রাখার জন্য স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনী মোতায়েন করার জন্য জাতিসংঘকে দাবী জানানো এখন সময়ের ব্যাপার। মুক্ত মনে প্রশান্ত হৃদয়ে আমাদের প্রথম কাবা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে আল আকসায় নামায পড়ার গ্যারান্টি চাই।

সহাবস্থান স্থিতিশীল শান্তির বাতারণ সৃষ্টি করতে পারে নতুন মেরুকরনে এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফিলিস্তিনীদের ও মুসলিমদের জন্য যা মঙ্গলজনক হবে তাই যেন আল্লাহর পক্ষ হতে পাওয়া যায়।

লেখক: প্রেস এন্ড পাবলিকেন্স সেক্রেটারি, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে শুকনো ৫টি ফল

ডায়াবেটিস রোগীরা প্রায়ই বলেন, তারা খাবারে মিষ্টি খাচ্ছেন না, তা সত্ত্বেও রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, খাবারের পাশাপাশি চারপাশে এমন কিছু ফল রয়েছে যা খেলে চিনির পরিমাণ কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে কিছু ফল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের পক্ষে ভালো, এতে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

যে কোনও রোগকে ডেকে আনতে ডায়াবেটিসের জুড়ি নেই। অতিরিক্ত সুগার চুপি চুপি একের পর এক অঙ্গকে অকেজো করে দেয় কিডনি থেকে লিভার থেকে চোখ। তাই প্রথম থেকেই সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

চিকিৎসকদের মতে, খাদ্যাভ্যাসে বড় রকম পরিবর্তন হলে রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়তে পারে। আবার রাত জাগলে বা দিনের বেলা ঘুমোলেও রক্তে সুগারের পরিমাণ বাড়তে পারে। মানসিক উদ্বেগ, অবসাদ, দুশ্চিন্তা তো আছেই।

শহরে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খেলাধুলা ব্যায়াম, এক কথায় কায়িক পরিশ্রম না করলেও রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০.৩ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।

তবে, আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য এই ৫ রকমের খাবার অত্যন্ত উপকারী বলে মত দিয়েছেন।

বাদাম: রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে বাদাম। বাদাম টাইপ-২ ডায়াবেটিসযুক্ত লোকদের জন্য ভালো। বাদামের মধ্যে অসম্পৃক্ত ফ্যাটগুলো হৃৎপিণ্ডসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলোকে সুরক্ষা দেয়। শুধু এটিই নয়, প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটি শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি সমীক্ষা অনুসারে বাদামে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, থায়ামিন, ক্যারোটিনয়েডস, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এবং ফাইটোস্টেরল রয়েছে।

ডায়াবেটিসরোগীরা প্রতিদিন পেস্তা বাদাম খান

পেস্তা খাওয়ার অর্থ শরীরকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি দেওয়া। এটিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং চর্বি রয়েছে। ২০১৫ সালের এক গবেষণায় গবেষকরা ৪ সপ্তাহের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসযুক্ত ব্যক্তিদের ডায়েটে পেস্তা সমৃদ্ধ খাবার রাখা হয়েছিল। চার সপ্তাহ পরে এই লোকদের মধ্যে এলডিএল এবং এইচডিএল কোলেস্টেরলের অনুপাতটি লক্ষণীয় ছিল। কেবল এটিই নয়, পেস্তা খাওয়ার ক্ষেত্রেও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল, যা আরও ভালো কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত দেয়।

কীভাবে খাবেন: এক বাটি ফলের স্যালাডের সঙ্গে ৩০টি পেস্তা প্রতিদিন খাওয়া যেতে পারে। সুগার রোগীদের কাজু বাদাম খাওয়া ভালো। এইচডিএল থেকে এলডিএল কোলেস্টেরলের অনুপাত উন্নত করতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে কাজু দুর্দান্ত।

২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় গবেষকরা ৩০০ জনকে কাজুযুক্ত খাবার দেওয়া হয়েছিল ১২ সপ্তাহের পর দেখা যায় টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এই অংশগ্রহণকারীদের রক্তচাপ কেবল হ্রাসই ঘটেনি। তবে এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কী ভাবে খাবেন: ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতিদিন এক মুঠো কাজু খাওয়া উচিত। আখরোট ডায়াবেটিস বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। খুব কম লোকই স্বাস্থ্য সচেতন।

তবে আখরোট ডায়াবেটিস বৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষা করে। বিএমজে ওপেন ডায়াবেটিস রিসার্চ অ্যান্ড কেয়ার দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আখরোট খাওয়ার ফলে শরীরের ওজন বা তার গঠনের উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। গবেষকরা ৬ মাস ধরে ১১২ জন অংশগ্রহণকারীদের আখরোট সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হয়।

কী ভাবে খাবেন: খোসা ছাড়ানো পর কাঁচা আখরোট খান।

চিনাবাদাম খান

গবেষণায় দেখা গেছে, চিনাবাদাম ডায়াবেটিস রেরাগীদের জন্য ভালো বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৩ সালে পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মহিলাদের জন্য ডায়েটে চিনাবাদাম দেওয়া হয়েছিল। চিনাবাদাম খাওয়ার ফলে মহিলাদের রক্তে শর্করার মাত্রা এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়।

কী ভাবে খাবেন: ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিন ২৮ থেকে ৩০টি চিনাবাদাম খেতে পারেন।

[সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি]

মোবাইল আসক্তি শিশুদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়

ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে শিশুদের মোবাইল আসক্তি দিন দিন বাড়ছে। অনেক অভিভাবকদের ব্যস্ত তা বা মোবাইল আসক্তির কারণে সন্ত ানদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিচ্ছেন। যার ফলে মাত্র ৪-৫ মাস বয়স থেকেই চোখের ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল ২ মিনিটের জন্য ফোনে কথা বলা ও স্ক্রিনের মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন হয়ে যায়। মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপটি মেজাজের ধরণ এবং আচরণগত প্রবণতার পরিবর্তনের কারণ।

শিশুদের নতুন জিনিস শিখতে বা সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে সমস্যা হয়। শিশুদের অতিরিক্ত জেদ, অসামাজিকতা ও খিটখিটে মেজাজ এর অন্যতম প্রধান কারণ।

শিশুদের মোবাইল আসক্তি বেড়ে যাওয়ার কারণে পারিবারিক বন্ধন ধারণায় পরিবর্তন আসছে বলে মনে করছেন গবেষকরা। সিএনএন অবলম্বনে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, 'স্মার্টফোনের এই আসক্তি অনেকটাই সংক্রামক। কোন ঘরে বা আড্ডায় কেউ একজন হাতে স্মার্টফোন তুলে নিলে দ্রুতই অন্যরাও একে একে হাতে নিয়ে তাতে নজর বুলাতে শুরু করেন।'

এছাড়াও, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ক্যাথেরিন স্টাইনার অ্যাডায়ার সিএনএনকে বলেন, 'অনেক মানুষেরই কিছুক্ষণ পরপর স্মার্টফোন চেক করার বদঅভ্যাস আছে। প্রতিটি নোটিফিকেশন, লাইক, কমেন্ট এসব যেন তাদের মস্তিষ্কে একটা আনন্দ সংবাদের মতো প্রতিক্রিয়া করে এবং তারা উদগ্রীব হয়ে ফোন দেখতে শুরু করেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ানলাইট ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী শারমিন আহমেদ শিশুদের মোবাইল আসক্তি কমানোর উপায় সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'মোবাইল নিয়ে শিশুদের আসক্তির (স্ক্রিন এডিকশন) ফলাফল শুভ নয়।'

শিশুর একাকিত্ব ঘোচাতে প্রচুর গল্প করুন।

শিশুরা ছোটবেলা থেকে বড়দের অনুকরণ করে। মাতৃগর্ভে থাকাকালে গল্প শুনলেও তার মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি পায়। তাই শিশুকে বেশি সময় দিতে হবে এবং গল্প করতে হবে।

ঘরে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের পরিমাণ কমাতে হবে। কারণ শিশুরা প্রথম শিক্ষা পায় পরিবার থেকে। তাই বাবা-মাকে এক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। যতটা সম্ভব শিশুদের সামনে মোবাইল বা ডিভাইস পরিহার করুন।

ঘরের চারদিকে শিশুদের উপযোগী খেলনা রাখতে পারেন। এতে করে আপনার শিশু সেগুলোর প্রতি মনোযোগী হবে। এতে করে সে একা থাকলেও ছবি আঁকার চেষ্টা করবে। বাসায় প্রচুর পরিমাণে বই রাখুন। শিশুদের ঘরে অবশ্যই মিনি লাইব্রেরি তৈরী করা উচিত। অবসর সময়ে অবিভাবকের বই পড়ার অভ্যাস থাকলে সন্তানও তা রপ্ত করবে।

হুযূর সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র সোহবতধন্য মুরিদ আনজুমান ট্রাস্ট'র ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক'র ইন্তেকাল

আলে রসূল গাউসে জামান হুযুর সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র সোহবতধন্য মুরিদ একনিষ্ঠ খেদমতগার আনজুমান ট্রাস্ট'র ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক গত ১৭ মে রাত ৩-২৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৬ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতি-নাতনী, আত্মীয় স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান।

পরদিন ১৮ মে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মরহুমের ১ম নামাজে জানাযা জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান'র ইমামতিতে জামেয়া ময়দানে এবং ২য় নামাজে জানাযা বাদ যোহর বাকলিয়াস্থ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী (রহ.) জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে হাফেজ মাওলানা নূরউদ্দিন'র ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, দরবারে আলীয়া কাদেরীয়ার সাজ্জাদানশীন হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.জি.আ.), পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মা.জি.আ.), সাহেবজাদা সৈয়্যদ মুহাম্মদ কাশেম শাহ্ (মা.জি.আ.), সৈয়্যদ মুহাম্মদ হামেদ শাহ্ (মা.জি.আ.), আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহমদ শাহ্ (মা.জি.আ.), তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দো'য়া ও মুনাজাত করেন।

জানাযার পূর্বে শ্রদ্ধা-সমবেদনা ও তাঁর জীবন কর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন-আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার), যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার প্রমুখ। তাঁরা বলেন, আনজুমান, জামেয়া ও গাউসিয়া কমিটি একজন নিবেদিতপ্রাণ খেদমতগার হারালো, যা কোনদিন পূরণ হবার নয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আনজুমান-জামেয়ার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সৎ সদালাপী নিষ্ঠাবান সহজ সরল জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল আপন মোরশেদ কেবলা নির্দেশিত ও প্রদর্শিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন। আনজুমান-জামেয়া, মসজিদ, মাদরাসা ও দ্বীনের খেদমতে তাঁর জীবন উৎসর্গিত ছিল। তিনি গাউসে জমান আলে রসূল আল্লামা হাফেজ কারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র খলীফা মরহুম আলহাজ্ব ওয়াজের আলী আলকাদেরী (রহ.)'র ছোট ভাই। তাঁদের গোটা পরিবার এ দরবারে আলিয়া কাদেরিয়া সিরিকোটির খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি আজীবন অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে আনজুমানের ফাইন্যান্স সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে যান। পাশাপাশি দায়েম নাজির জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া জামে মসজিদের সেক্রেটারি ও ট্রেজারার এর দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'র সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিয়াজ উদ্দীন বাজার তিনপুলের মাথাস্থ গোলাম রসূল ওয়াকফ জামে মসজিদের সেক্রেটারি ছিলেন।

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী অধাপক কাজী শামসুর রহমান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, আনজুমান ট্রাস্ট'র সদস্য মুহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, শেখ নাছির উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, আবদুল মোনাফ সিকদার, মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুর, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ, ঢাকা মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা, রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদ্‌রাসা, অধ্যক্ষবৃন্দ, জামেয়ার উপাধ্যক্ষ ড. আবু তৈয়ব মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-

সদস্যবৃন্দ, আনজুমান, মাসিক তরজুমান'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

স্মরণ সভা ও মিলাদ মাহফিল

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার শিক্ষক মিলনায়তনে গত ২৫ মে অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদরাসা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলহাজ্ব মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, জামেয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, মুফতী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলক্বাদেরীসহ জামেয়ার শিক্ষক মন্ডলী বক্তব্য রাখেন।

সভায় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও তাঁর স্মৃতিময় বর্ণাঢ্য দীর্ঘ কর্মজীবনের উপর আলোচনা করা হয়। অধ্যক্ষ মহোদয় বলেন, মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক সাহেব ছিলেন সৎ, বিনয়ী, মৃদুভাষী, সদালাপি, অতিথিপরায়ন, পরহেজগার, খাঁটি নবী-অলি প্রেমিক ও বিশ্বস্ত আমানতদার। তিনি ছিলেন কুতবুল আউলিয়া জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.) এর সোহবতে ধন্য খালেস ওফাদার আনজুমানের অন্যতম খাদেম। দীর্ঘ ৫০ বছরেরও অধিক সময় তিনি হুজুর ক্বিবলা শাহেন শাহে সিরিকোটের প্রতিষ্ঠিত এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ও আনজুমানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুন্নবী, মাওলানা মীর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মাওলানা আবুল আছাদ মুহাম্মদ জুবাইর রজভী, মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মাওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ, মাওলানা মুহাম্মদ রবিউল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মাষ্টার মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ জালালুদ্দীন, মাওলানা হাফেয আহমুদুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন আল কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী আলকাদেরী স্মৃতি সংসদের মাহফিলে বক্তারা

আপন মুর্শিদ কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অবিচল ছিলেন আলহাজ্ব সিরাজুল হক

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরী (রহ.) স্মৃতি সংসদ আয়োজিত স্মৃতি সংসদের উপদেষ্টা ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব সিরাজুল হকের ইসালে সাওয়াব মাহফিল ও সভা গত ২০ মে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ বাকলিয়া আলহাজ্ব ওয়াজের আলী (রহ.) এবাদত খানায় অনুষ্ঠিত হয়। আনজুমান ট্রাস্ট'র এডিশনাল সেক্রেটারি ও স্মৃতি সংসদের উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন মাওলানা মোজাম্মেল হক হাশেমী, মরহুমের মেঝ সন্তান এনামুল হক বাচ্ছু, মাওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ আনসারী, মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাবেক কর্মকর্তা ছাদেক হোসেন পাপ্পু, হাফেজ আজহারুল হক আজাদ, জামাল উদ্দিন সুরুজ, জানে আলম জানু। স্মৃতি সংসদের উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ সিদ্দিক, এস.এম. ফারুক উদ্দিন, সেলিম খোকন, আজিম উদ্দিন, মাহমুদুল হক, শেখ দিদার উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, মোহাম্মদ বশির, মোহাম্মদ হামিদ, মাওলানা নুর উদ্দিন, সাদমান আলী সামির, আজোয়াদ আলী, আবুল মনসুর, মোহাম্মদ জাফর, মোহাম্মদ কাশেম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আলহাজ্ব সিরাজুল হক সারা জীবন আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া সহ মাজহাব মিল্লাতের নিরলস খেদমত করে গেছেন। এছাড়াও খোদাভীতি ও আপন মুর্শিদ কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অটল ও অবিচল ছিলেন তিনি। পরে মিলাদ, দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর বর্বর হামলার প্রতিবাদে গাউসিয়া কমিটির মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

গত ২০ মে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে গাজায় ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর ইসরাইলের বর্বর হামলা ও নির্বিচারে ফিলিস্তিনি শিশু-নারীসহ সাধারণ নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকরা ৭০ বছর আগে একটি স্বাধীন দেশকে ধ্বংস করার জন্য অনুপ্রবেশকারী দখলদার ইহুদীদ্বারা যে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেছিল, তা এখন বিশ্বসভ্যতার জন্য বিষফোঁড়ায় পরিণত হয়েছে। অসভ্য, বর্বর এবং চক্রান্তকারী ইহুদীরা কত অমানবিক এবং ইসলাম বিদ্বেষী তা প্রমাণ করার জন্য সম্প্রতি গাজায় নির্বিচারে হত্যাকান্ডের উদাহারণই যথেষ্ট। তারা বলেন, ইসরাইল ফিলিস্তিনে মানবতা বিরোধী যে অপরাধ সংঘঠিত করছে-এর দায় জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রকেও নিতে হবে। বক্তারা জাতিসংঘকে 'টুটোজগন্নাথ' আখ্যায়িত করে বলেন, এটিকে জাতিসংঘ না বলে জাতিনিধনের সংঘ বলাই উত্তম। মানববন্ধনে বক্তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আপনার নেতৃত্ব প্রশংসিত হচ্ছে, ফিলিস্তিনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জনে আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এ জাতি আশা করে। বক্তারা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে ইসরাইল বিরোধী একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন আহ্বানের উদ্যোগ নিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠিত হবে। বক্তারা অবিলম্বে গাজায় ইসরাইলি হামলা ও নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জমান আরকাদেরী, গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, আলহাজ্ব মাহবুবুল হক খান, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার মাহবুবুল আলম, আলহাজ্ব তাসকির আহমদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাস্টার, মিডিয়া সেলের প্রধান অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সদস্য এরশাদ খতিবী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের কেন্দ্রীয় সদস্য মাস্টার আবুল হোসাইন, গাউসিয়া কমিটি মহানগর শাখার মনির উদ্দিন সোহেল, মাওলানা ইলয়াছ আলকাদেরী ও খায়ের মোহাম্মদসহ জেলা ও থানা নেতৃবৃন্দ।

রংপুর মহানগর শাখার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর মহানগর শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ৩ মে স্থানীয় কামাল কাছনায় আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী দুলুর সভাপতিত্বে ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী আকবরের উপস্থাপনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রংপুর মহানগর শাখার পক্ষ থেকে গরীব দুস্থদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ রেজাউল করিম হায়দার, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জীবন, সদস্য মোহাম্মদ আলী মাহমুদ প্রিতম। রংপুর মহানগরের ৩৩টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ও পীর ভাইয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ দুঃস্থ পরিবারকে ঈদ উপলক্ষে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় গাউসিয়া কমিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব ডাঃ বি. এ. আনছারী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাফিজার রহমান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম, মোহাম্মদ হাসান আলী, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খন্দকার, মোহাম্মদ আবুল কাশেম কোরায়েশী, মোহাম্মদ আনিকুল আহসান চৌধুরী, মোহাম্মদ আমিনুল আহসান বিপ্লব, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠুল, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, প্রফেসর মোহাম্মদ মোস্তাকিম, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, মোহাম্মদ জাভেদ আলী, মোহাম্মদ শাহ আলম, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, কাজী মুহাম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ ওসমান গনি, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সাইদুর রহিম সফি, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন আদিল, মোহাম্মদ আসলাম পারভেজ, মোহাম্মদ জিন্নুর ইসলাম, মুহাম্মদ হায়দার আলী, মওলানা মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ বাদল আশরাফী, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

টাঙ্গাইল জেলা শাখার ত্রাণ বিতরণ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদ ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২৮ মে সকল ১০ ঘটিকায় বাঘিল সাপুয়াস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া খানকা শরীফে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন গাউসিয়া কমিটি টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল হাই। ৪০ জন দুঃস্থকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সহায়তা প্রদান করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনসহ গাউসিয়া কমিটি ও মাদরাসা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। মাদরাসা সুপার এইচ.এম. মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনা ও মুনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

বাজিতপুর উপজেলা শাখার মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাজিতপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে কৈলাগ গাউছিয়া বাজার সংলগ্ন ময়দানে মুফতি সৈয়দ আমিমুল ইহসান (রহ:), বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর জিন্দাপীর (রহ:) পীরে তরীক্বত মাওলানা সৈয়াদ ওয়াজেদ আলী (রহ:) স্মরণে ১৪ তম মিলাদ মাহফিল বাজিতপুর উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আবদুল মুস্তফা সৈয়দ মুহাম্মদ মহসিন মাইজভান্ডারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে বক্তব্য পেশ করেন- সৈয়দ আশরাফ হোসাইন, সৈয়দ বরকত উল্লাহ্ সাবের, সৈয়দ আরহাম উল্লাহ, মাওলানা হারুন অর রশিদ জিহাদী, মাওলানা হাফেজ কাওছার রেজা, হাফেজ মাওলানা আব্বাস উদ্দিন, হাফেজ তাফসিরুল ইসলাম, মাওলানা বেলাল উদ্দিন প্রমুখ। মাহফিল শেষে মোনাজাত করেন- আব্দুল মুস্তফা সৈয়দ মুহসিন মাইজভান্ডারী।

হাটহাজারী (পূর্ব) থানার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানা শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্প্রতি মধ্য মাদার্শাস্থ খানকা-এ কাদেরিয়া তৈয়বিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সে সংগঠনের সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাস্টার সেকান্দর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জমির উদ্দনি মাস্টার। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী (পূর্ব) থানার প্রধান উপদেষ্টা ও খানকাহ- এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন। এতে উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুন সওদাগর, কামরুল আহসান চৌধুরী, মাওলানা আবদুল খালেক, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আজিম, মাস্টার খোরশেদ আলম, আহসান হাবীব চৌধুরী, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, আবু ইউসুপ চৌধুরী, মুহাম্মদ আজম আলী, অধ্যাপক জামাল উদ্দীন, সেকান্দর হোসেন চৌধুরী, মুহাম্মদ ইউসুফ। কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয় সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান, সিনিয়র সহ সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ জাকারিয়া, সহ সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়া, এমদাদুল ইসলাম, সেকান্দর মাস্টার, ফরিদুল আলম মিঠু, মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দীন চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক নাছির উদ্দীন মোস্তফা, সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবছার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার এনামুল হক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সবুর, অর্থ সম্পাদক লোকমান হাকিম, সহ অর্থ সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক সৈয়দ পেয়ার মুহাম্মদ, সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা নাঈম উদ্দীন, মাওলানা আরিফ সোবহান, রায়হান উদ্দীন, দপ্তর সম্পাদক আজাদুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এস.এম. জসিম উদ্দিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা শাহজাহান আলী, সমাজসেবা সম্পাদক ফোরকান উদ্দীন সাহেদ। নির্বাহী সদস্য- মাওলানা লিয়াকত আলী খান, ফখরুল হক মানিক, এস.এম. সোলায়মান, আবদুল্লাহ্ শাহ্, মুহাম্মদ জামশেদ, মোজাম্মেল হক।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন আনজুমান ট্রাস্টের সদস্য মনোনীত হওয়ায় অভিনন্দন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানা শাখার প্রধান উপদেষ্টা ও খানকাহ্ এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও

সমাজসেবক আলহাজ্ব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন দ্বীনি সংস্থা আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সৈয়দ এনামুল হক, অর্থ সম্পাদক লোকমান হাকিম সওদাগর, বুড়িশ্চর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলহাজ্ব ইকবাল হোসেন, শিকারপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ জাকারিয়া, উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ ও দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়নের সভাপতি মাস্টার সেকান্দর হোসেন এক যৌথ বিবৃতিতে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন।

পাহাড়তলী থানা শাখার ঈদ পুণর্মিলনী সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার ঈদ পুনর্মিলনী ও যাকাত-ফিতরা সংগ্রহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা সম্প্রতি সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আইয়ুব এর সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদা। বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক, মুহাম্মদ মুছা, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মাওলানা আবদুল হালিম, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, কে.এম নুর উদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ শাহাবউদ্দিন, মুহাম্মদ আজিম, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম হাসিব, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ ইলিয়াস, মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ আলী হোসেন, মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, প্রমুখ।

কচুয়াই ফারুকিপাড়া শাখার ঈদ পুণর্মিলনী সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ফারুকীপাড়া শাখার ঈদ পুণর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা ফারুকীপাড়া ইবতেদায়ী ইসলামিয়া ফোরকানিয়া মাদরাসা ময়দানে ১৪ মে বাদ মাগরিব কমিটির সেক্রেটারী মোহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পটিয়া উপজেলা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কচুয়াই ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মুহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মোরশেদ ফারুকী ও সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম ফারুকী। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন ফারুকী (বাবলা), ১নম্বর ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ ইমরান ফারুকী, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক ফারুকী, মুহাম্মদ শাকিল হোসেন ফারুকী, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুকী, মোহাম্মদ মহিদুল আলম ফারুকী, মুহাম্মদ এরশাদ ফারুকী, মোহাম্মদ জোবায়েদ উল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ আসিফ ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মুহাম্মদ তানভীর ফারুকী, মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল ইসলাম ফারুকী (রিমু), মুহাম্মদ জাওয়াদুল ইসলাম ফারুকী, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন ফারুকী প্রমুখ।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও খতমে গাউসিয়া শরীফ গত ১৯ মে বাদ মাগরিব মুসলিম মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মোহাম্মদ নাইমুল হাসান তানবীর, মুহাম্মদ মনির হোসেন মনু, হাজী মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ নুরুল হক, ইসতিয়াক, ইয়াকীন, নাফিজ প্রমুখ। খতমে গাউসিয়া শরীফে মোনাজাত করেন গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুপার হাফেজ মওলানা আবদুল হালিম।

বরমা ইউনিয়ন শাখার ঈদ পুণর্মিলনী সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বরমা ইউনিয়ন শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা গত ২২ মে, শাখার সভাপতি মোহাম্মদ ফোরকান সওদাগরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ফেরদৌস আলম'র পরিচালনায় মোস্তফা কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বরমা ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সহ-সভাপতি আব্দুল

মতিন, জাবেদ মোহাম্মদ গউস মিল্টন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সরওয়ার কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ওসমান গণী, অর্থ সম্পাদক মিজানুর রহমান হাসান ও দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মাহবুব আলম ও আবু সাঈদ আসিফ। বক্তারা ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এ হামলা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

বড়লিয়া ইউনিয়ন আওতাধীন শাখাসমূহের কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ০১নং বেলখাইন ওয়ার্ড শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল স্থানীয় ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় মুহাম্মদ গাজী দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে মওলানা গাজী শাহাদাত হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা: মুহাম্মদ আবু ছৈয়্যদ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম সহ-অর্থ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ-সাধারণ সম্পাদক ডা: আজমগীর সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাইল, অর্থ সম্পাদক হাফেজ আহমদ, ইউনিয়ন সদস্য সিরাজুল ইসলাম বাবু, মুহাম্মদ ছৈয়্যদুল করিম সহ উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে গাজী নেজাম উদ্দীনকে সভাপতি, গাজী মুহাম্মদ ইয়াকুব আলীকে সাধারণ সম্পাদক, গাজী শাহাদাত হোসাইনকে দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

বাড়ৈকাড়া ওয়ার্ড শাখা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বড়লিয়া ইউনিয়ন ৫নং পূর্ব বাড়ৈইকাড়া ওয়ার্ড শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল স্থানীয় ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় মুহাম্মদ ফেরদৌস সওদাগরের সভাপতিত্বে মুহাম্মদ ইসমাইলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন উপজেলা সভাপতি মাহবুবুল আলম এম.কম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাগির হোসাইন মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সহ অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আজমগীর মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ইমরান হোসেন, মুহাম্মদ ছৈয়্যদুল করিম, মুহাম্মদ রফিক প্রমুখ। সকলের মতামতের ভিত্তিতে ফেরদৌস সওদাগরকে সভাপতি, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (সজীব) কে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ ইসমাইলকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ সাইফুল হক চৌধুরীকে অর্থ সম্পাদক, মওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন কাদেরীকে দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক করে ৪২ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

বড়লিয়া ওয়ার্ড শাখা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ০৭নং পেরলা ওয়ার্ড শাখার দ্বি- বার্ষিক কাউন্সিল স্থানীয় মদন গাজী জামে মসজিদের গাজী নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মওলানা ইয়াছিন সুমনের সঞ্চালনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম সহ- অর্থসম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ইউনিয়ন সিনিয়র সহ- সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ-সাধারণ সম্পাদক ডা: মুহাম্মদ আজমঙ্গীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ হাফেজ আহম্মদ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ, দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ইউনিয়ন শাখার সদস্য আলী আজগর সওদাগর প্রমুখ উপস্থিত প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে গাজী মুহাম্মদ এহসান হিরুকে সভাপতি, গাজী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ রফিককে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ সালাউদ্দীন রাজীবকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন সুমনকে দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

৬নং পেরলা ওয়ার্ড শাখা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৬নং পেরলা ওয়ার্ড শাখার দ্বি- বার্ষিক কাউন্সিল স্থানীয় ছৈয়্যদ আহম্মদ মিয়া সওদাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে মুহাম্মদ ছৈয়্যদুল করিমের সভাপতিত্বে জামশেদ শরিফ রনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন উপজেলা সভাপতি মাহবুবুল আলম এম.কম, সাংগঠনিক সম্পাদ আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, সহ-অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান নির্বাচন

কমিশনার ছিলেন ইউনিয়ন সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবছার, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা: আজমগীর, অর্থ সম্পাদক হাফেজ আহম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাইল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ, মুহাম্মদ রফিক প্রমুখ উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে মুহাম্মদ ছৈয়্যদুল করিমকে সভাপতি, মুহাম্মদ ছাদেক হোসেন টিপুকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ আমানত উল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন জনিকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মওলান আলাউদ্দীনকে দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক করে ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় ।

মেলঘর ওয়ার্ড শাখা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং বড়লিয়া মেলঘর ওয়ার্ড শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল মধ্যম বড়লিয়া কেন্দ্রীয় শাহী জামে মসজিদে শামসু সওদাগরের সভাপতিত্বে মুহাম্মদ নছরুল আলম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন পটিয় উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা: মুহাম্মদ আবু ছৈয়্যদ, উপজেলা প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল হোসেন সওদাগর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন, ইউনিয়নের সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ- সাধারণ সম্পাদক ডা: মুহাম্মদ আজমগীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ হাফেজ আহম্মদ, সদস্য মুহাম্মদ ছৈয়্যদুল করিম প্রমুখ সকলের মতামতের ভিত্তিতে মুহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরীকে সভাপতি, মুহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ নছরুল আলম চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মওলানা ইমরান হোসেন রানাকে দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় ।

মোহরা বার আউলিয়া শাখা গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, চান্দগাঁও থানা মোহরা ৫নং ওয়ার্ড আওতাধীন উত্তর মোহরা বার আউলিয়া শাখা গঠন কল্পে এক সভা গত ৩১ মার্চ উত্তর মোহরা সৈয়্যদ আমির ফকির (রহ.) বাড়ির সৈয়্যদ নুরুল ইসলামের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর মোহরা বি শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান এর সভাপতিত্বে মোহরা ওয়ার্ড যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইব্রাহীম খানের সঞ্চালনায় এতে প্রাধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মোহরা ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহের, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি মোহরা ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ হারুন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম বেলাল, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক-জামশেদুল আলম সুমন, সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদ আলম । সভায় নিম্নোক্ত কমিটি গঠিত হয় ।

সভাপতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ফয়সাল আহমদ, মুহাম্মদ তারেক আজিজ, সৈয়্যদ মুহাম্মদ আসাদুল হক, মুহাম্মদ মিরাজ খান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর আসিফ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাসান, অর্থ সম্পাদক- মুহাম্মদ রোমান, সহ-অর্থ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জুবায়েদ, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক-মুহাম্মদ তৌহিদ, সহ প্রচার সম্পাদক- ইফতিখার হোসেন, দপ্তর সম্পাদক-জুবাইর রায়হান নাঈম, সহ দপ্তর সম্পাদক সৈয়্যদ আহমদুল হক, সদস্য-সৈয়্যদ মুহাম্মদ মোরশেদুল ইসলাম, মুহাম্মদ মারুফ, সৈয়্যদ আইনুল হক, মুহাম্মদ আজবির, মুহাম্মদ তৌসিফ, আফরান ফয়েজ আমান ।

উত্তর মোহরা বি ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ,চান্দগাঁও থানার মোহরা ৫নং ওয়ার্ড আওতাধীন উত্তর মোহরা বি ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ২৬ মার্চ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ শাহেদ আলমের সঞ্চালনায় এতে প্রাধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মোহরা ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহের, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি মোহরা ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইব্রাহীম খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু তাহের, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম বেলাল ।

উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদেরকে সভাপতি, মুহাম্মদ শাহেদ আলমকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম মোমেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন আশরাফকে দাওয়াতে খায়র সম্পাদক করে কার্যকর কমিটি গঠন করা হয় ।

জামেয়ার কৃত্রি ছাত্র হাফেজ মাসুম মোহাম্মদ ইমরান'র হেফজ প্রতিযোগিতায় সারাদেশে সেরা দশের গৌরব অর্জন

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার কৃতি শিক্ষার্থী হাফেজ মাসুম মুহাম্মদ এমরান হেফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ'র শ্রেষ্ঠ ১০ জন হাফেজের মধ্যে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে। ইক্বরা ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সে এ কৃতিত্ব অর্জন করে। ইক্বরা ফাউন্ডেশন সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করে। নগদ ১ লাখ টাকা পুরস্কার ও সনদপত্র লাভ করে।

দোহাজারি পৌরসভার জামিরজুরি গ্রামের দরবেশ পাড়ার জামিরজুরি সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম লতিফির কনিষ্ঠ সন্তান হাফেজ মাসুম মুহাম্মদ এমরান বর্তমান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার কামিল হাদীস বিভাগে অধ্যয়ন রত। ইতোপূর্বে সে জামেয়ার জুলুস মাঠে আয়োজিত আরবি ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বহু পুরস্কার লাভ করে মেধার স্বাক্ষর রাখেন। গত ২৩ মে জামেয়া সংলগ্ন আলমগীর খানকা শরীফে পবিত্র গেয়ারভী শরীফ মাহফিলে জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান বলেন আমাদের মাদরাসার মেধাবী শিক্ষার্থী যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে সেখানে সারা দেশের বিভিন্ন মাদরাসার অনেক হাফেজ অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাঁর সাফল্যে আমরা গর্বিত আনন্দিত। সে জামেয়ার সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। আনজুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, জামেয়ার ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে তা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। জামেয়ার শিক্ষার্থীদের উপর মাশায়েখ হযরাতের নেগাহে করাম রয়েছে। তাই জামেয়ার ছাত্ররা যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলে বাতিলপন্থীরা সামনে আসতে পারবে না। তিনি বলেন, পুরস্কারের পরিমাণ বড় কথা নয় পুরস্কারে ভূষিত হওয়া স্বীকৃতি পাওয়াটাই গর্বের বিষয়। তিনি হাফেজ মাসুমকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্য ছাত্রদেরও এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য হাফেজ মাসুম তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের ১ লাখ টাকা হতে ২০ হাজার টাকা তাঁর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়ার জন্য দান করেন।

শোক সংবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ ফারুকীর বার্ষিক ফাতিহা উদ্‌যাপিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ফারুকীপাড়া শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ ফারুকী (রহ.) এর ১ম বার্ষিক ফাতিহা শরীফ ও স্মরণ সভা কচুয়াই ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। সেক্রেটারী মোহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ গোলাম মাওলা ফারুকী এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরী। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম ছোবহানিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকর আলী চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মাওলানা মুহাম্মদ মতিউল ইসলাম এবং আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন খতীবি। গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার, মুহাম্মদ মোরশেদ ফারুকী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম ফারুকী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল মাবুদ আলক্বাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিচ, মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম ফারুকী, এডভোকেট রেফায়েত হাসান ফারুকী (জসিম), কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ ফারুকী, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক ফারুকী, মুহাম্মদ এরশাদ ফারুকী, মোহাম্মদ জোবায়েদ উল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মুহাম্মদ তানভীর ফারুকী, মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল ইসলাম ফারুকী (রিমু), মুহাম্মদ জাওয়াদুল ইসলাম ফারুকী, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন ফারুকী প্রমুখ। সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ ফারুকী (রহ.) ছিলেন একজন সত্যিকারের সুনাগরিক তৈরীর কারিগর ও সমাজে দ্বীন-ধর্ম, মাযহাব-মিল্লাত প্রচার প্রসারের অগ্রদুত।

আবদুস শুক্কুর মেম্বার

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ সালামত আলীর পিতা সাবেক মেম্বার আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুস শুক্কুর (৯১) ২৭ মে বৃহস্পতিবার, বিকাল ৪ ঘটিকার সময় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ ছেলে, ৬ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের নামাজে জানাযা হাটহাজারী চৌধুরী হাট হযরত জালাল উদ্দিন বোখারী (রহ.) মাজার কমপ্লেক্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি মাহবুবুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বায়েজিদ থানা শাখার সভাপতি আবদুল হামিদ সর্দার, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের সভাপতি মোহাম্মদ আলী শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

দেলোয়ার হোসেন কোম্পানি

বায়েজিদ শহীদ নগর নূর-ইসহাক হোসাইনী জামে মসজিদ ও এতিমখানা কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবক আলহাজ্ব দেলোয়ার হোসেন কোম্পানি (৬৫) গত ২১ মে নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে...রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ৬ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদে আছর শহীদ নগর গাউছিয়া জামে মসজিদ মাঠে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইন্তেকালে নূর-ইসহাক হোসাইনী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা জিয়াউল হক আল কাদেরী, গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার সভাপতি আবদুল হামিদ সর্দার, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাবিবুর রহমান, শহীদনগর শাখার সভাপতি মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানি,সাধারন সম্পাদক মুহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহাম্মদ ছারওয়ার আলম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা শাখার উপদেষ্টা, বাজিতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ছারওয়ার আলম (৫৪) গত ৮ মে শনিবার, ভোর ৫ ঘটিকায় ঢাকা রেনেসা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও অসংখ্য আত্মীয় স্বজন গুণগ্রাহী রেখে যান। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাজিতপুর উপজেলা সভাপতি আব্দুল মুস্তফা সৈয়দ মুহসিন মাইজভান্ডারী তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন ছারওয়ার আলম চেয়ারম্যান একজন সুন্নীয়তের সৈনিক নিরহংকার, তরিক্বতের নীরব সেবক ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কবির আহমদ সওদাগর

গাউসিয়া কমিটি পটিয়া পৌরসভার সদস্য ও গাউছে জামান হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) একনিষ্ট মুরিদ কবির আহমদ সওদাগর (৬০) গত ৯ মে রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় ইতেকাফরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৫ মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য আত্মিয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, পটিয়া পৌরসভার সভাপতি কাজী মুহাম্মদ মহসিন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শফিউর রহমান

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী শাকপুরা ৭নং ওয়ার্ড শাখার সদস্য মুহাম্মদ আব্দুল করিম সওদাগরের পিতা প্রবীন সমাজসেবক মুহাম্মদ শফিউর রহমান (১০৩) গত ২৮ মে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ২ মেয়ে, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের ইন্তেকালে শাকপুরা ৭নং ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন।

মির্জা মুহাম্মদ সৈয়দ মাস্টার

রাঙ্গুনিয়া মোগলেরহাটস্থ তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মির্জা হোসাইনিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি মোগল পরিবারের কৃতি সন্তান মির্জা মুহাম্মদ সৈয়দ মাস্টার (৯০) গত ১৯ মে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি রাঙ্গুনিয়া উত্তর শাখার উপদেষ্টা মাওলানা আজিজুল হক আল কাদেরী, সভাপতি মাওলানা আবুল

কালাম বয়ানী, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতালাব মাতব্বর, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মির্জা ওমরা মিয়া, দাতা সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সৈয়দ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহাম্মদ হাশেম সওদাগর

গাউসিয়া কমিটি ১৭ নং ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন মদিনা মসজিদ শাখার উপদেষ্টা মোহাম্মদ হাসেম সওদাগর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন মিয়াবাপের জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর জানাযা হয়। তাঁর ইন্তেকালে ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন, আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, ওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জানে আলম জানু গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সৈয়দ রাশেদা বেগম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলাধীন ৯নম্বর ওয়ার্ড (ক) বড়লিয়া ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছৈয়দ মাওলানা আবুল কাশেম মাস্টারের সহধর্মীণী ছৈয়্যদা রাশেদা বেগম গত ১ রমজান ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উপজেলার সভাপতি মাহবুবুল আলম এম.কম. সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, ইউনিয়ন সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার গভীর শোক প্রকাশ করে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।